আল্ বাহি আল্ খাওলী

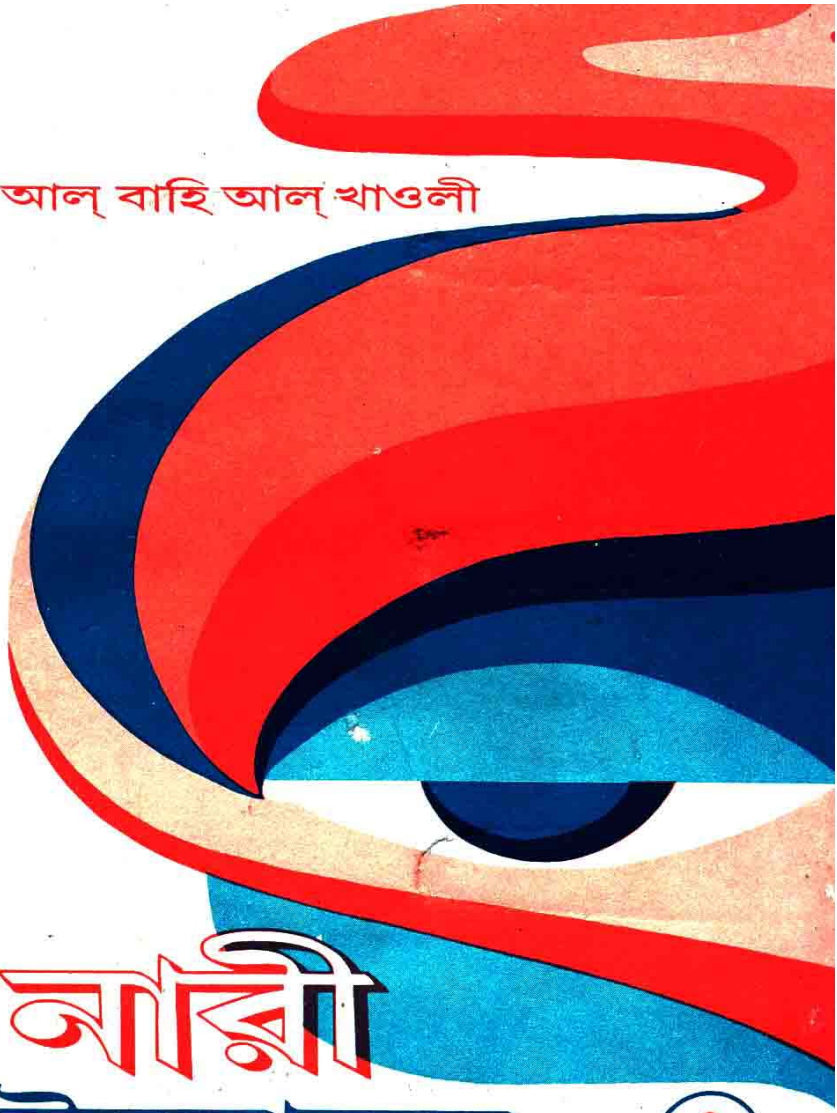

নারী ইসলামের দৃষ্টিতে

১

নারী ঃ
ইসলামের দৃষ্টিতে

(১ম খণ্ড)

আল্‌বাহি আল্‌ খাওলি (মিসর)

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ নুরুল হুদা (ভারত)

সিন্দাবাদ প্রকাশনী
SHINDABAD PROKASHONI

প্রকাশিকা : বেগম হালিমা সালাম
প্রযত্নে :—মোঃ সাখাওয়াৎ আলী
১৮/ই নিরিবিলি আ/এ,
পুরাতনকসবা, যশোর

প্রথম মুদ্রণ—আগষ্ট—১৯৮৮
মূল্য :—সাদা—৪৪.০০
নিউজ—২২.০০

মুদ্রণে :
সিন্দাবাদ প্রিন্টার্স
৫৪ নং সামসাবাদ লেন
নিম্না বাজার, ঢাকা—১১০০

প্রকাশিকার কথা

মানব জাতির অর্ধেক নারী, আর এই "নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা" ও "নারী নির্যাতনের প্রতিকারের" জন্য যেমন চারিদিক থেকে দাবী উঠছে ও আন্দোলন হচ্ছে তেমনি প্রত্যেক দেশের সরকারগণও নারীকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার জন্য একের পর এক আইন তৈরী ও সংশোধন করে চলেছে। আমাদের দেশেও এর জন্য কম হয়নি। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান না হয়ে দিন দিন সমস্যা বেড়েই চলেছে। প্রকৃত পক্ষে সমাজে নারীর স্থান কোথায়? তাদের অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্যই বা কি? ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাবেই যত সমস্যার সৃষ্টি। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত চিন্তাধারা নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যতই দাবীর সংখ্যা বেড়েছে ততই সমস্যারও বৃদ্ধি ঘটেছে। অথচ এ বিষয়ে ১৪০০ বৎসর পূর্বে—ইসলাম সঠিক সমাধান দিয়েছে। মানব সমাজে নারী সম্পর্কিত ইসলামের বিস্তারিত সঠিক ধারনা দেয়ার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে আমরা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক আবু সলিম মোঃ আবদুল হাই (ভারত) ও মুহাম্মদ আবদুর রহীম (বাংলাদেশ) নারী সম্পর্কিত ২টি বই "ইসলামী সমাজ গঠনে নারীর দায়ীত্ব" ও "নারী" প্রকাশ করেছি। বর্তমানে এ বইটিও আর একটি সংযোজন। পাঠক সমাজের ক্রয় ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখে বইটি আমরা ২ খন্ডে ভাগ করে প্রকাশ করলাম। "হিন্দুস্তান পাবলিকেসন্স এন্ড ট্রেডিং কোম্পানী" বইটি আমাদের প্রকাশের অনুমতি প্রদান করায় আমরা তাঁদের নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অন্যান্য যারা এ ব্যাপারে সাহায্য করেছেন তাদেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বইটি সমাজের দ্বীনি খেতমতে এলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে এবং তা আমাদের আখেরাতে কাজে আসবে বল আল্লার দরবারে এ প্রার্থনা করি।

—প্রকাশিকা

অনুবাদকের কথা

নারীর যথাযোগ্য মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে আজ থেকে প্রায় দেড়হাজার বছর আগের মানবতার মুক্তিদূত হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই প্রথমবার নারীজাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন। আর ইসলামের সার্বজনীন বিপ্লবী আদর্শে সবার আগে বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন একজন নারী—উম্মুল মো'মেনিন হযরত খাদীজাতুলকোবরা রাজীয়াল্লাহুতায়ালা আনহা। এরপর থেকে ইসলামের গোটা ইতিহাসে মুসলিম নারী তার নিজ দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রে বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে।

ইসলামী আদর্শ মোতাবেক মুসলিম পরিবার ও মুসলিম সমাজে নারীরা অধিকার ও মর্যাদা এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সেখানে, অমুসলিম পরিবার ও সমাজের নারীদের মতো অপমান বঞ্চনা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা ভাববারও অবকাশ থাকে না। তাই দেখতে পাচ্ছি যে আজ সারা বিশ্বের অমুসলিম নারী সমাজ যখন তাদের ন্যায্য অধিকারের দাবী তুলছে তখন মুসলিম মহিলা সমাজ তাদের যথার্থ মুক্তির জন্যে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানাচ্ছে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা নারীকে ভোগবিলাসের নিষ্প্রাণ পণ্যে পরিণত করে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। পুঁজিবাদী পাশ্চাত্য বলুন, বা সমাজতান্ত্রিক পাশ্চাত্য, উভয় ক্ষেত্রেই নারী-সমাজ দারুনভাবে অবহেলিত ও বঞ্চিত।- উভয় সমাজেই নারীকে পুরুষের মনোরঞ্জন এবং পুরুষালী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই নারীর স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র, বিশেষ অধিকার এবং স্বতন্ত্র মর্যাদাকে অস্বীকার করে। আর উভয় গোষ্ঠী প্রভাব বলয়ে নারীসমাজের সাথে একই দুর্ব্যবহারের মহড়া চলছে। অন্যদিকে তথাকথিত ধর্মগুলো তো যেন নারীকে মানুষ হিসেবেই মানতে চায় না।

কোন কোন ধর্ম নারীকে 'সকল পাপের উৎস' বলে ঘোষণা করেছে। কোন কোন ধর্ম নারীর আত্মা আছে বলে অস্বীকার করে, আবার এমন ধর্মও আছে যা নারীকে মানুষ বলে বিবেচনা করতেও অনিচ্ছুক। খৃস্টানদের বাইবেল, ইহুদীদের তৌরাত, বৌদ্ধদের ত্রিপিটক, পারসিকদের জিন্দাবেস্তা, শিখদের গ্রন্থসাহেব আর হিন্দুদের বেদঋগবেদ বা গীতার কোথাও নারীদের অধিকার ও মর্যাদাসংক্রান্ত কোন আইনবিধির অস্তিত্ব নেই, এমনকি নারীদের মর্যাদা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন আলোচনা পর্যন্ত নেই। এর পরিবর্তে নারী-নির্যাতন ও নারীর অবমাননা এবং লাঞ্ছনার অনেক লোমহর্ষক কাহিনী, অথবা যৌন ব্যভিচারের অশ্লীল আলোচনাই পরিলক্ষিত হয়। এভাবে আধুনিক পুঁজিবাদ, সমাজবাদ বলুন বা তথাকথিত ধর্মগুলোর কথা বলুন—কোথাও নারীকে তার স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়নি। সর্বত্র সব সময় নারীকে ভোগের সামগ্রী এবং পুরুষের সেবাদাসী হিসেবেই বিবেচনা করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

নারী সমাজের সাথে প্রাচীন ও আধুনিক শোষক গোষ্ঠীর নিষ্ঠুর দুর্ব্যবহার ইসলামের দৃষ্টিতে এক জঘন্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। ইসলাম নারী ও পুরুষকে, মানব অস্তিত্বের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা আর দুটি হাতের মতোই সমগুরুত্বের অধিকার বলে মনে করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা, সমগুরুত্ব ও সমঅধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। শারীরিক ও মানসিক গুণবৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জন্যে ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করে দিয়েছে যাতে কেউ কারো উপর অন্যায়-অত্যাচার বা শোষণ করতে না পারে।

জীবনের অন্যান্য বিষয়-বিভাগ ও ক্ষেত্রের মতো এ সম্পর্কেও ইসলাম শুধু নীতি নির্দ্ধারণই করেনি, বরং বাস্তব জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে তার সকল কার্যকারীতাও প্রমান করেছে।

পবিত্র কোরানে নারীদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, আইনবিধি ও সিদ্ধান্তপূর্ণ আদেশ রয়েছে, কোরান শরীফের পূর্ণ একটি সূরার নামই হচ্ছে 'নিসা' অর্থাৎ "নারীগণ" এছাড়া কোরানের অন্যান্য সূরা-

তেও নারী সংক্রান্ত আইনকানুন রয়েছে। এসব কোরানী আইন ও আদেশে নারীদের যাবতীয় স্বাভাবিক অধিকার ও চাহিদার আলোকে সবরকমের সমস্যাবলির সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ সমাধান পেশ করা হয়েছে। নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত কোন বিষয়ই কোরানের আলোচনা ও বিধিবিধান থেকে বাদ পড়েনি।

ইসলাম ও বিশ্বমানবতার দরদী প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোরানের এক একটি আইনবিধিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ণ করেন। মহিলাদের অধিকার এবং মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে; তিনি নিজেই তার বাস্তব দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। প্রিয়নবী (সঃ) ব্যক্তিগতভাবে ও মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। মহিলাদের জানমাল ও মর্যাদার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি যে কত বেশী সজাগ ও সচেষ্ট ছিলেন তাঁর বাণী ও ভূমিকাতে তার প্রমান পাওয়া যায়। নারী জাতির অধিকার ও মর্যাদা দান সম্পর্কিত তাঁর অসংখ্য হাদীস রয়েছে। বিশেষ করে বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি নারীদের জন্যেও স্থায়ী মুক্তিসনদ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের অন্যায় কর্তৃত্ব, নির্যাতন ও শোষনের হাত থেকে নারীজাতিকে চিরদিনের জন্যে মুক্তিদান করেন। তিনি নারীদের সাথে কৃত সবরকমের বিভেদ বৈষম্যেরও স্থায়ী অবসান করেন। নারীরাও যে আল্লার প্রিয়পাত্রী এবং পুরুষের মতোই স্বাধীন বিবেক বুদ্ধির মালিক হতে পারে, একথা বিশ্বের মানুষ প্রথমবার প্রিয়নবী (স)র কাছেইশুনতে পেয়েছে। তিনি স্বামী, পিতা ও সন্তানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিতে মহিলাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ঘোষণা করলেন যে "মায়ের পদতলে সন্তানের স্বর্গ।" তিনি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যে শিক্ষা অর্জনকে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন এবং নিজ কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের আয় উপার্জনের অধিকার দান করেন।

এভাবে জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নারী ও পুরুষের অধিকার, মর্যাদা এবং দায়িত্বের স্পষ্ট পন্থা-নির্দেশ করে ইসলাম একটি সুখিসুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা কায়েম করে। জীবনের কোনক্ষেত্রে কোথাও কারো গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়নি, বরং পারস্পরিক সহযোগিতা ও আস্থার বন্ধনকে

করা হয়েছে মজবুত স্থিতিশীল ও শৃংখলাপূর্ণ। আজকের এই জড়বাদী যুগে যেখানে জীবনের সর্বত্র অশান্তি, অসন্তোষ, বৈষম্য ভেদাভেদ আর বিশৃংখলার জয়জয়কার চলছে, সেখানে সামগ্রিকভাবে ইসলামী জীবনাদর্শের বাস্তবায়ণ করে সঠিক সমস্যাবলির সুষ্ঠ ও স্থায়ী সমাধান করা যেতে পারে। বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার আলোকে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার বিভেদ বৈষম্য দূর করে দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, জাতীয় জীবন্য এবং তার আন্তর্জাতিক জীবনের সর্বত্র সমমর্যাদা, সব অধিকার ও সৌহার্দ্য-পূর্ণ সহাবস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে।

এই উদ্দেশ্যে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার এবং ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে মহিলাদের সংঘবদ্ধ হওয়া একান্তই আবশ্যক। এ ব্যাপারে সচেতন ভাই-বোনেরা নিজ নিজ ভূমিকা পালন করবেন—এটাই আমাদের কামনা।

বর্তমান গ্রন্থটিতে প্রখ্যাত মিশরীয় চিন্তাবিদ্ জনাব আল্ বাহি আল্-খাওলি অত্যন্ত যত্নের সাথে ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং নারী সংক্রান্ত ইসলামের যাবতীয় আইন-বিধি ব্যাখ্যাসহ পেশ করেছেন।

গ্রন্থটি, নারী সমস্যা 'সংক্রান্ত ইসলামী নীতি সম্পর্কে যাবতীয় ভুলধারণা ও বিভ্রান্তির অপনোদন এবং নারীদের অধিকার, মর্যাদাও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা প্রচারে বিরাট অবদান রাখবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আল্লাহ্, সকল মহৎ, প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

নূরুল হুদা
নতুন দিল্লী

ভূমিকা

"সীমাহীন প্রশংসা সেই মহান আল্লার যার মেহেরবানীতে যাবতীয় মহৎ-কর্ম সুসম্পন্ন হয় এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম তার রাসূল মুহাম্মদ (স) এর প্রতি যিনি হেদায়াত ও কল্যাণময় পথে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবাবৃন্দ এবং মহাপ্রলয় পর্যন্ত যত মানুষ তাঁকে অনুসরণ করবে তাঁদের প্রত্যেকের উপর বর্ষিত হোক রহমত-বরকত, ও শান্তির অফুরণন্ত ধারা।"

উনিশ বছর আগে ১৯৫১সালে আমি আমার "আল্ যারয়াতু বাইনাল্ বাইতে ওয়াল মুজতামা" গ্রন্থটি লিখি। তাতে আমি বিক্ষিপ্ত সমস্যাবলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। তার ভূমিকায় আমি আমার দৃষ্টিকোণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলাম। আজ আমি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে "নারী ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে" পেশ করছি। এই গ্রন্থের বিষয়ববস্তু তার রচনার উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সাবেক গ্রন্থ থেকে আলাদা। সাবেক গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবদান এবং কতিপয় যুবকের সমস্যা ও সংকটের নিরসন করা। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য যা তার শিরোনামেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে,—নারী সমস্যা সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর ইসলামী সমাধান পেশ করা।

সাধারনভাবে আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করেন যে, এর জন্যে এখনো পরিবেশ অনুকুলে নয়, কারণ আধুনিক যুগের নারী এখন সবরকমের সেকেলে ধ্যান-ধারণ থেকে মুক্তি লাভের প্রয়াসী এবং পাশ্চাত্য জীবনদর্শনকে তারা নিজেদের লক্ষ্যে পরিণত করেছে। ওখানে তারা সব রকমের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত কিন্তু এখানে তার সম্পর্ক অতীতের সাথে সম্পৃক্ত যা তাদের নৈরাশ্য ও স্থবিরতার দিকে ঠেলে দেয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সমস্যার সমাধানের জন্যে এ ধরণের চিকিৎসা একদম অর্থহীন, বরং আসল কথা এই যে, আমরা যখন নারী-

স্বাধীনতা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করি তখন সেই চিন্তাধারাকে সর্বপ্রথম আমরা নিজেরাই নিজেদের মন থেকে ঝেঁটিয়ে বের করি। আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করবেন না যে, এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে সব রকমের দৃষ্টিকোণ এবং পূর্ব বৈষম্যমূলক চিন্তাধারার পরিবর্তন জরুরী এবং শুধু বুদ্ধিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করি যে, প্রকৃতির কোন্ সেই আইনাবলী ও উদ্দেশ্য রয়েছে যার ভিত্তিতে নারীকে জীবন-সংগ্রামে সীমিত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। কেন না, আল্লাহ যে নারীকে শুধু সৌন্দর্য্য ও ভোগের জন্যেই সৃষ্টি করেননি তা বলা বাহুল্য, বরং এক নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও স্পষ্ট উদ্দেশ্যেই তাকে সৃষ্টি করেছেন। এখন যদি আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা সেই সত্য ও বাস্তবতাকে না মানেন এবং অস্বীকার করেন তাহলে তাঁদের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্যে আমাদের কাছে একটি মাত্র পথই আছে, আর তা হচ্ছে এই যে, আমরা নারীত্বের দৃষ্টি-কোণ থেকেই নারী সমস্যার আলোচনা করবো—নারীকে পুরুষ ভেবে নয়। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে এ ব্যাপারে আলোচনার স্বাভাবিক পন্থা, এছাড়া অন্য কোন পন্থাই প্রভাবশালী বা বাস্তবানুগ হতে পারে না। এ ছাড়া অন্য সব মত এবং পথই ভ্রান্ত, বাতিল, বুদ্ধি-বিরুদ্ধ, বাস্তবতা-বিমুখ ও যুক্তিহীন হতে বাধ্য।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা সেই স্বাভাবিক পন্থারই অনুসরণ করছি। কারণ প্রকৃতির পন্থা—নির্দেশনা এবং স্বভাবের অভিমত সব দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য হয় এবং সরাসরি আসল সত্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। সত্যানুসন্ধানীর জন্যে এছাড়া আর কোন পথই অনুসরণযোগ্য হতে পারে না।

—আল্-বাহি আল্-খাওলি
মিসর

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়— ১

নারী প্রাগৈতিহাসিক যুগে ২

প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান : চীন ৪

ভারত ৪

গ্রীস ৫

রোম ৬

আরব ৭

ইহুদীবাদ ৮

খৃস্টান পন্ডিত ৮

অতীত ভ্রান্তির সারমর্ম এবং ইসলামের অভিমত ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়—

সমঃ অধিকার ১৩

ইসলামে নারীর মানবাধিকার ১৪

নারীর ধর্মীয় মর্যাদা ১৯

অর্থনৈতিক অধিকার ২১

সামাজিক অধিকার ২৪

সমাজ ও নারী ৩০

তৃতীয় অধ্যায়—

বিশেষ অধিকার ৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ—বিবাহ ৩৯

বিবাহ এবং প্রকৃতির বিধি ৩৯

বিয়ে ও মানব স্বভাব ৪০

বিয়ে ও সামষ্টিক স্বভাব ৪৪

বিয়ে ও যৌন প্রবৃত্তি ৪৬

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব ৪৭

বিবাহের নীতি ভঙ্গ তার প্রভাব ও ফলাফল ৪৯
অবিবাহিত জীবন ও তার অপকারিতা ৫০
যৌন নৈরাজ্য ও তার কুফল ৫২
অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব ৫৪
বিবাহের নির্বাচন : স্ত্রীর নির্বাচন ৫৯
ধন সম্পদের মান ৫৯
বংশ মর্যাদা ৬০
রূপ নকসা ৬০
স্বামী নির্বাচন ৬১
স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার ৬২
বিয়ের প্রস্তাব ৬৫
মোহর : মোহরের পরিমান ৬৯
মোহর নারীর অধিকার ৭২
যৌতুক ৭৩
বিয়ের উৎসব : ওলীমা ৭৫
বিয়ের আনন্দ ৭৭
স্ত্রীর অধিকার : ভরণপোষণ ৮১
পারস্পারিক সম্প্রীতি ৮২
স্বামীর অধিকার ৮৬
স্বামীর আনুগত্য ৮৬
দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার ভিত্তি ৮৯
সুবিচার ৯০
সাম্য ৯১
পারস্পারিক শলাপরামর্শ ৯১
নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য ৯৪
পুরুষের দায়িত্বশীলতা ৯৭
নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা ১০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী সংখ্যা ১০৭
একাধিক স্ত্রীর উদ্দেশ্য যৌন তৃপ্তি অর্জন নয় ১০৮

একাধিক স্ত্রী—নিছক অনুমতি মাত্র ১০৯
সীমা নির্ধারণই উদ্দেশ্য, স্বেচ্ছাচারিতা নয় ১১০
দারিদ্রে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ ১১২
একাধিক স্ত্রীর অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনে ১১৪
একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দানের পিছনে মহত্তম উদ্দেশ্য ১১৬
উপসংহার ১২১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তালাক ১২৩
ইসলাম তালাককে অপছন্দ করে ১২৩
তালাক ও যৌন বিলাসিতা ১২৪
তালাক ও মতপার্থক্য ১২৬
যে সব কারণে তালাক অকার্যকরী হয়ে যাবে ১২৮
তালাকের নিয়ম-নীতি ১৩১
স্ত্রীর অবাধ্যতা ১৩২
খোলা ১৩৪
খোলা আর যুক্তি ১৩৫
খোলা আর সমস্যায় কাযীর ক্ষমতা ১৩৭
স্বামীর অবাধ্যতা ১৩৮
স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ ১৪০
শরীয়তের বিধিবিধান ১৪০
তালাকের শরীয়তী নিয়মনীতি ১৪৩
সুন্নাতী ও বিদআতী তালাক ১৪৬
তালাকের শিষ্টাচার ১৪৮
ইদ্দত ১৫০
ইদ্দতকালীন কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা ১৫২
দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের বিধিব্যবস্থা ১৫৪
তালাক—ইসলাম ও খৃষ্টবাদের দৃষ্টিতে ১৫৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হালালা ১৬০

প্রথম অধ্যায়

"হে মানব জাতি! আপন প্রতিপালককে ভয় কর
যিনি তোমাদের এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন
এবং সেই প্রাণ থেকেই তার জোড় বানিয়েছেন
এবং সেই দুজন থেকে অনেক অনেক পুরুষ ও নারী
পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।
সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা
একে অন্যের কাছে নিজের অধিকার দাবী কর।
আর আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ক নষ্ট করা
থেকে বিরত থাক।
নিশ্চিত জেনে রাখ যে আল্লাহ্‌ তোমাদের
তত্ত্বাবধান করছেন।"

আল কোরআন: (নিসা ১)

নারী প্রাগৈতিহাসিক যুগে

আমরা যখন প্রাচীন মানবেতিহাস এবং তার সভ্যতা সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তখন এমন কয়েকটি তিক্ত তথ্য জানতে পাই, যাতে তাদের সরলতার সাথে সাথে অজ্ঞতা, মূর্খতা, দুঃখ-দুর্দশা, ভীতি, বাতিকতা এবং অন্যের সামনে নিজেকে বড় করে প্রকাশ করার প্রবনতা দেখা যায়। আর যখন হিংস্র বন্য জন্তুদের সাথে লড়াইয়ের যুগ শেষ হয় তখন আমাদের সামনে মানবেতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হয়. যাতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহ, দস্যুবৃত্তি, চুরি, দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, অন্যের সম্পত্তিতে জবরদখল বিস্তার, ক্রীতদাস প্রথা এবং শিশু নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনাবলির বিস্তর উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। আর এসব দুষ্কর্ম শুধু এই জন্যেই করা হতো যেন তারই মতো অন্য মানুষেরা তার অধীনস্থ হয়ে তার ঘর-বাড়ী, ক্ষেত-খামার, গৃহপালিত পশু এবং অন্যান্য বিষয়-আশয়ের দেখাশুনা করে।

আমরা এ সম্পর্কে আরো গভীর আলোচনা না গিয়ে এবং আরো তিক্ত তথ্যাবলির উল্লেখ না করে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে প্রাচীনযুগের মানুষ কি এজন্যে নিন্দার যোগ্য? তারা তো তখন সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছিল মাত্র। আর সে যুগের অবস্থায় যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা, লুন্ঠন, পরস্পরকে অধীনস্থ দাস বানিয়ে রাখার প্রয়োজন কি অপরিহার্য্য ছিল?

এই প্রশ্নটিই আবার অন্যভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই; এক ব্যক্তি তার শত্রুর উপর আক্রমণ চালাতে অথবা হামলা প্রতিহত করতে বের হয়। সেখানে বিজয়ী অবস্থায় কি তার শত্রুপক্ষের গর্ভবতী বৃদ্ধা বা অন্য কোন দুর্বল মহিলাকে ক্ষমা করবে? আর কোন বিজয়ী দল কি বিজিত শত্রু সম্পদ বন্টনের বেলায় তার মহিলাদের মুক্তিদান করবে? অথবা এভাবে যদি কোন গোত্রের যুবকরা একত্রিত হয়ে কোন যুদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী করে বা কোন গোত্রের উপর হামলার সিদ্ধান্ত

নেয় এবং সে অবস্থায় যদি মহিলাদের শরীক না করে তাহলে তাদেরকে নিন্দার যোগ্য মনে করা হবে ?

তাছাড়া এটাও বিবেচ্য ব্যাপার যে প্রাচীন যুগীয় মানুষ নিজের কোন সন্তানের উপর আনন্দিত হবে ঘোড়ার পিঠে চাবুক হেনে যুদ্ধে অংশ-গ্রহণকারী ছেলের, বা সেই মেয়ের, যে নিজের নিরাপত্তা তো দূরের কথা বরং যোদ্ধাদের জন্যে এক আলাদা বোঝা বলেই প্রমাণিত হয় ? আর যাদের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই যতসব যুদ্ধ সংঘটিত হয় ?

মোটকথা, প্রাচীনতম যুগে নারীর মর্যাদা খর্ব হবার পেছনে দুটি বিরাট কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ এই যে, নারীদের কর্মক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই সীমিত ও নির্দিষ্ট ছিল।

আর দ্বিতীয় কারণ ছিল—যুগের দাবী অনুযায়ী নারীর কাজ শুধু এটাই ছিল যে পুরুষদের মনে নানা রকম কামনা-বাসনার সৃষ্টি করা এবং যুদ্ধের জন্যে তাদের উৎসাহিত করা। জয়ী হলে তাদের প্রশংসা করা এবং বিজয় ও সাফল্যের আবেগময় স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা।

প্রাচীনতম সমাজে মহিলাদের মান ও মর্যাদা নির্দ্ধারণে এই দুটি কারণ ছিল গভীরভাবে কার্যকরী। পরে যুগের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির সাথে সাথে সরকারী ও প্রশাসনিক আইন বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধির জন্য কিছু নীতি নির্দ্ধারিত হতে থাকে। এসব আইনবিধি ও নীতিমালার প্রনয়ণ ছিল সেই বর্বরযুগের প্রত্যক্ষ চাহিদা। এভাবে রীতিনীতির পরিবর্তন ঘটে এবং জাতি ও গোত্রের মধ্যে কিছু কিছু আইনগত কাঠামো গড়ে উঠে। এরপর তাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দ্ধা-রিত হয় এবং এভাবে নারী সামাজিক অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়, এছাড়া যাবতীয় উন্নতি অর্থহীন হয়ে থেকে যায়। ক্রম-বিকাশের এই পর্যায়ে নারীর যে সামাজিক অবস্থান ছিল তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা নীচে আলোচনা করবো।

প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান

চীন

চীনে নারীর সামাজিক অবস্থান ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চীনারা তাদের নারীদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতো। উচ্চপর্যায়ের এক চীনা মহিলা নিজ সমাজে নারীর অবস্থান নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে লিখেন :—

> "আমাদের নারীদের স্থান হচ্ছে মানবতার সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান এবং এজন্যেই আমাদের অংশে এসেছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম।"

তারই এক নীতিকথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—

> "নারী কতো হতভাগিনী! পৃথিবীতে তার মতো মূল্যহীন দ্রব্য আর কিছুই নেই। ছেলেরা দোরমুখে এমনভাবে দাঁড়ায় যেন তারা আকাশ থেকে আগত কোন দেবতা কিন্তু মেয়েদের জন্ম মুহূর্তেও আনন্দের শানাই বাজেনা। যখন তারা বড় হয়ে উঠে তখন তাদের বদ্ধ ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় যেন কোন মানুষ তাকে দেখতে না পায়, আর যখন সে নিজ গৃহ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার জন্যে দুফোঁটা অশ্রু ফেলার মতো কেউ থাকেনা।"[১]

ভারত

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মনুস্মৃতির অধ্যয়নে জানা যায় যে, মনু যখন নারী সৃষ্টি করে তখন সে নারীকে পুরুষের প্রতি প্রেম, রূপচর্চা, যৌন ব্যাভিচারে লিপ্ত থাকা এবং ক্রোধের প্রবনতা দান করে এবং মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করে নারীকে নিকৃষ্টতম ব্যবহারের উপযুক্ত বলে ঘোষণা

---

১) কিস্‌সাতুল হামারার চীন সভ্যতা শীর্ষক অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা-২৮৩, লেখক—V.V. KANT অনুবাদ—Mohammad Badran.

করে। সুতরাং হিন্দু সমাজে এই ধারণা খ্যাতি অর্জন করে যে, নারী হচ্ছে নোংরামীর জড় এবং তার অস্তিত্ব হচ্ছে আগাগোড়া নরক।১
মনু শাস্ত্রে এও বলা হয়েছে যে,

> "অনুগত স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীর সেবা এইভাবে করে যেন সে তার প্রভু। তার ব্যাপারে এমন কোন কথা না বলে যা তার জন্যে দুঃখজনক হয়,—তা তার স্বামী বড় লম্পট আর বদমাশই হোকনা কেন। কেননা, কেবল ঐ জন্যেই নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর যখন সে তার স্বামীকে ডাকবে তখন অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে 'হে আমার উপাস্য' বলে ডাকবে। কিছু দূরত্ব বজায় রেখে তার পিছু পিছু চলবে এবং স্বামী তার সাথে বেশী থেকে বেশী একটি মাত্র কথা বলবে। নারী স্বামীর সাথে খাবার গ্রহণ করবে না, বরং স্বামীর উচ্ছিষ্টসে খাবে।"২

গ্রীস

প্রাচীন গ্রীক সমাজের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে নারীর কোন ভূমিকা ছিলনা এবং নারী ছিল সম্পূর্ণরূপে সমাজ বিচ্ছিন্ন। নারীকে একান্ত অর্থহীন দ্রব্যের মতো ঘরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হতো। এমনকি বড় বড় গ্রীস দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও মনে করতেন যে, নারীর অস্তিত্বের মতো নারী নামটাকেও যেন বদ্ধঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়।৩ তারা নারীকে নিছক সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করতো। এছাড়া নারীর অন্য কোন কাজ থেকেই থাকে তাহলে তা এই যে সে স্বামী এবং অন্যান্য পুরুষদের সেবা করবে। 'স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালবাসা' একথাটি ছিল গ্রীকদের

---

১) বিশ্ব ইতিহাস—পৃষ্ঠা ৩৯৪, বলা বাহুল্য হিন্দু সমাজে আজো নারীকে সকল পাপের উৎস মনে করা হয় এবং হিন্দু ধর্ম মতে নারীর কোন অধিকার বা মর্যাদা নেই।

২) হামারাতুল হিন্দ পৃষ্ঠা—১৭৯

৩) গ্রীক ইতিহাস—১১৪—১১৭

জন্যে একান্ত দুর্বোধ্য কথা। অবশ্য প্রেম ভালবাসার জন্যে তাদের আলাদা ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যাপারে চমৎকার চিত্রাংকন করেছেন প্রখ্যাত গ্রীক চিন্তা বিদ ডেমোস্তিন। তিনি বলেন :

> "আমরা যৌনতৃপ্তি অর্জনের জন্যে বেশ্যালয়ে যাই এবং আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচী তৈরী করে থাকে বালিকা বন্ধুরাই আর আমরা কেবল আইনগতভাবে সন্তান উৎপাদনের জন্যেই স্ত্রী গ্রহণ করি।"

এজন্যে বিয়ের পর মেয়েরা পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে চলে আসে। কিন্তু তা এজন্যে নয় যে, সে স্বামীর ঘরের কর্ত্রী হবে। তা নয় বরং স্বামীর ঘরে তাকে আসতে হয় শুধু সে সেবিকার দায়িত্ব পালন এবং সন্তান উৎপাদন ও তার লালন পালনের জন্যেই।

রোম

রোমান সভ্যতাকে পাশ্চত্য পদ্ধতির গণতন্ত্রের সূতিকাগার বলা হয়। সেখানে পরিবারের প্রাচীন পুরুষই ছিল ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গুরু; সব সম্পদ, ক্ষমতা এবং অধিকারের একচ্ছত্র মালিক হতো সে'ই। সব রকমের বেচা-কেনা, মামলা, চুক্তি ইত্যাদি তারই ইচ্ছিয়ারাধীন ছিল।

রোমান সমাজেও নারীর কোন গুরুত্ব, অধিকার বা মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না। কোন রকমের আইনগত অধিকার থেকেও নারী ছিল বঞ্চিত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু আর পাগলের মতো নারীকেও মনে করা হতো অযোগ্য ও অক্ষম। নারী হয়ে জন্ম নেয়াই ছিল তার অযোগ্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এমনকি যা বাবার কাছ থেকে বিয়ের যৌতুক বা পিতার হিসেবে পাওয়া সম্পত্তিতেও নারীর কোন অধিকার ছিল না। স্বামীর ঘর করার সাথে সাথে স্ত্রীর সব ব্যক্তিগত সম্পদও স্বামীর মালিকানায় চলে যেতো। রোমান নারী আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল, এমনকি তার সাক্ষী দেবার অধিকার ও ছিল না।

রোমান সমাজে অন্য এক ধরণের বিয়েশাদীরও প্রচলন ছিল। এই বিয়েকে "সর্দারী বিয়ে" বলা হতো। এর মাধ্যমে যেকোন নারী সর্দারের স্ত্রী বলে গণ্য হতো এবং একবার কেউ সর্দারী বিয়ের কবলে পড়লে তাকে তার সাবেক

পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হতো এবং কখনো তার উপর কোন অভিযোগ লাগানো হলে তাকে সর্দারের সামনে পেশ করা হতো যেন নিজ হাতে তার শাস্তি দিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে তো সর্দার অভিযুক্ত নারীকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার অধিকার রাখতো; যেমন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।

এছাড়া কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রী ছেলেদের উত্তরাধিকারে পরিণত হতো, যদি পুত্র-সন্তান না থাকতো তাহলে বিধবাটি স্বামীর ছোটভাই বা চাচার অধিকারে চলে যেতো।

আরব

আরবে তো অধিকাংশ লোক তাদের ঘরে মেয়ের জন্ম হবার খবর পেয়ে দস্তুরমতো দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তো। এমন এক সমাজে যেখানে যুদ্ধবিগ্রহই তাদের নিত্যদিনের প্রধান কর্ম, সেখানে মেয়েদের ব্যাপারে তাদের এই বিরূপ মনোভাব ছিল স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধ বিগ্রহের ধকল সইবার ক্ষমতা শুধু পুরুষেরই থাকতে পারে এবং পুরুষের বীরত্বের মাধ্যমেই গোত্রীয় মানমর্যাদা ছিল নির্ভরশীল। রইলো নারীদের ব্যাপার, তা তারাতো এধরণের কোন কাজেই আসতো না, বরং তারা ছিল শত্রুরা লোভনীয় লভ্য বস্তু। শত্রুর তাদের মেয়েদের ক্রীতদাসীতে পরিণত ক'রে তাদের সেবা এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারও করতো। এভাবে মেয়েরা ছিল গোত্রের জন্যে এক স্থায়ী বোঝা। কারণ সবসময়ে মেয়েদের নিরাপত্তার বিষয়টি তাদের দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। কেননা, তাদের মেয়ে শত্রুর অধিকারে যাওয়াটা ছিল গোত্রের জন্যে চরম অবমাননার বিষয়। এতে করে তাদের মাথা হেঁট হয়ে যেতো।

কোন কোন গোত্রে অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে ছিল যে, যদি কারো ঘরে মেয়ের জন্ম হতো তখন সে তীব্র মর্মযাতনা অনুভব করে এটা ভাবতে লাগতো যে এমন দুঃখজনক ও লজ্জাকর অবস্থার পরও মেয়েটিকে বাঁচতে দেবে, নাকি অপমানের এই প্রতীকটিকে হত্যা অথবা জীবন্ত পুঁতে দেবে! অনেক লোক এই শেষ সিদ্ধান্তটিকেই কার্যকরী করতো, অর্থাৎ মেয়ে সন্তানটিকে

জীবন্ত পুঁতে দিতো। এই নিষ্ঠুর ঘটনাবলির দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কোরানে বলা হয়েছে—

> "যখন তাদের মধ্যে কাউকে মেয়ে সন্তান হবার সুখবর দেয়া হতো তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যেতো এবং সে যেন তিক্ত ঢোক গিলে নিতো, লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতো যে, এই দুঃসংবাদের পর কিভাবে কাউকে মুখ দেখাবে। ভাবতে থাকে যে অপমানের সাথে মেয়েটিকে নাকি মাটিতে পুতে দেবে? দেখ; কেমন মন্দ কথা, যা এরা (খোদার উপর) আরোপ করে।" (আন্-নহল : ৫৮-৫৯)

আরবে এই প্রথাও ছিল যে যখন কোন স্ত্রীর স্বামী মারা যেতো তখন তার বড় ছেলে দাঁড়িয়ে যেতো এবং তার পিতার স্ত্রীকে যদি নিজের জন্যে প্রয়োজন মনে করতো তাহলে তার উপর নিজের জামা ছুড়ে মারতো এবং এভাবে সেই বিধবা তার একান্ত মালিকানায় এসেযেতো।

ইহুদীবাদ

ইহুদীরা যদিও এক অসমানী দ্বীনের অনুসারী ছিল কিন্তু তাদের মধ্যেও একদল বোনকে তার ভায়ের সমান অধিকার ও মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। ইহুদী সমাজে নারীর মান ছিল নিছক সেবিকার বরাবর। ইহুদী নারীদের, তাদের ভাইদের মতো সম্পত্তির উত্তরাধিকারে অংশ দেওয়া হতো না এবং ইহুদী পিতা তার প্রাপ্ত কিংবা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকারও রাখতো।

খৃষ্টান পণ্ডিত

খৃষ্টান পণ্ডিতরা তো দু'দুবার নারীদের মান খর্বকরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করে। অথচ এই খৃষ্টান পণ্ডিতরাই নিজেদেরকে দয়া ও স্নেহের অগ্রদূত বলে দাবী করতো। এরাই নারীদের ব্যাপারে তাদের "পবিত্র গ্রন্থে" থেকে এই বক্তব্যের উল্লেখ করে প্রচার করে যে,—

"নারীকে লজ্জায় মরে যাবার জন্যে এতটুকু কথাই যথেষ্ট যে সে নারী। তাছাড়া মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর মতো অবমাননার কারণও এই নারী।"

নারীদের ব্যাপারে খৃষ্টানদের ধারণাও ঠিক হিন্দুদের মনুর মতো ছিল যে, "নারী হচ্ছে নরকের দরজা এবং পাপের প্রতিমা।" কোন কোন খৃষ্টান পন্ডিত তো আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে, "নারী হচ্ছে শয়তানের সন্তান।" তারা আরো বলেছে—

"নারীদের উপর অভিসম্পাৎ করা অপরিহার্য, কেন না বিপথগামীতার আসল কারণ এটাই।"

খৃষ্টান পন্ডিতদের আর এক গোষ্টির ধারণা হচ্ছে--

"নারী হচ্ছে শয়তানেরই বহিঃপ্রকাশ! শয়তান নারীর বেশ ধরে দৃশ্যমান হয়।"

এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার ছিল খৃষ্টান পন্ডিত ও পাদ্রীদের! এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক যে "নারী কি পুরুষের মতো খোদার উপাসনা করতে পারে?" "নারী কি স্বর্গে যেতে পারবে? নারীর মধ্যে কি মানবিক আত্মা আছে? নাকি তারা ভৌতিক জীবনযাপন করে? - - -"

বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম ও সমাজে এই-ই ছিল নারীর অবস্থান। কোথাও মানবিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা স্বীকৃত ছিল না।

অতীত-ভ্রান্তির সারমর্ম এবং ইসলামের অভিমত

উপরের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি আমাদের সামনে অতীতে সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য সমাজ সমূহে নারী-জাতির নির্মম দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরেছে। এথেকে আমরা প্রাচীন যুগের নারীদের সামাজিক মান-মর্যাদার সঠিক অবস্থা অনুমান করতে পারি। আমাদের দৃষ্টিতে অতীতের উল্লেখযোগ্য ভ্রান্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ-

* পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর কোন মানবিক মান-মর্যাদা ছিল না। নারীর অধিকার আদায়ের কোন চেষ্টা-সাধনা কিম্বা পৃথক কোন কর্মক্ষেত্রও ছিল না। সামাজিক উন্নয়নে অংশ নেয়ার জন্যে তার কোন আলাদা ভূমিকা পালনের অবকাশও ছিল না। যেমন উপরে বলা হয়েছে, পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর মান এতোটা নিকৃষ্ট ছিল যে তারা নারীর মানবিকতা এবং তার মধ্যে আত্মা আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নকে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তুতে পরিণত করে। অতীতে পন্ডিতরা নারীকে আত্মাহীন এক অপবিত্র নোংরা অস্তিত্ব বলে মনে করতো। * অধিকাংশ পুরুষই মনে করতো যে নারীর উপাসনা করা বা সমাজে মর্যাদার সাথে জীবন যাপনের কোন অধিকারই নেই। যেমন হিন্দুদের মনুস্মৃতি অধ্যয়নে এটা জানা যায় যে মানুষ নারীকে মানবিক মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত বলে মনে করতো। অধিকাংশ পুরুষ তারই মতো ধারণা পোষণ করতো। মনু এবং তার অনুসারীরা নারীকে উপাসনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

* পরিবারে মেয়ে ও ছেলের মধ্যেকার সমতা বলতে কিছুই ছিল না। চীনা ও আরবী ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দেয়। হিন্দু পুরুষরাতো তাদের স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর চেয়েও নিকৃষ্টতর মনে করতো।

* প্রাচীন অতীতে নারীর কোন আইনগত মান বা মর্যাদাও ছিল না। তার কোনরকমের অর্থনৈতিক অধিকারও ছিল না। নারীর কোন জিনিষের

উপর মালিকানা বা উত্তরাধিকারের কোন অংশ ছিল না। নারীর কেনা-বেচা বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও অংশ নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। মোটকথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই নারীর উপর শোষণ নির্যাতন চলছিল এবং পুরুষ তার স্বেচ্ছাচারী কর্তা হয়ে থাকে। রোমান ইতিহাস থেকে এটাও জানা যায় যে, নারীর নারীত্বই ছিল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এই নারীত্বই তার অযোগ্যতা প্রমাণের জন্যে ছিল যথেষ্ট।

অতীতের এসব ভ্রান্তিকে এক কথায় বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে, যেহেতু তারা নারীকে মানুষ বলেই স্বীকার করতোনা এজন্যে তারা মানবিক মর্যাদা থেকে নারীকে বঞ্চিত করে। আর এর পেছনে তাদের সম্ভবতঃ এই যুক্তি ছিল যে যেহেতু নারী স্বাভাবিক ভাবেই দুর্বল এজন্যে জীবন সংগ্রামের ময়দানে সমস্যাবলির মোকাবেলা করা তার পক্ষে অসম্ভব।

এতক্ষণের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অতীতের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর নারীত্বই ছিল নারীর উন্নতি-অগ্রগতির সামনে সবচেয়ে বড় বাধা। নারীর স্বাভাবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুরুষরা সবসময়ই নারীর অধিকার ও মানমর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে।

কিন্তু হযরত মোহাম্মদ (স)-এর মাধ্যমে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই সেই অভিশপ্ত অতীতের সকল শোষণ ও জুলুমের অবসান ঘটে। ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে নারী জাতিকে মানবিক উন্নতি প্রগতির আসল বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং নারীর দৈহিক ও আধ্যাত্মিক অধিকার এবং সম্মান পুনর্বহাল করে। ইসলাম ঘোষণা করে যে, নারী পুরুষের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ বরং নারীকে তার নারীত্বের কারণে পুরুষ থেকেও বেশী মর্যাদার অধিকারী বলে ঘোষণা করে। ইসলাম নারীর স্বভাব প্রকৃতির আলোকে তার আসল মান নির্দ্ধারণ করে দেয় এবং তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করে দেয়। ইসলাম নারীকে সবরকমের অন্যায় বন্ধন থেকেও মুক্তি দিয়ে স্বাধীন, সক্ষম বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ মানুষ বলে ঘোষণা করে।

নারীজাতির যুক্তি-অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে, আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

এ সম্পর্কে আমাদের পরবর্তী আলোচনার শীর্ষক হবে "সম অধিকার।" সামনের অধ্যায়ে আমরা নারীর মানবিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা, তার মালিকানা-অধিকার, তার অর্থনৈতিক স্বাধিকার, সমাজ সংস্কারে নারীর দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং নারী হিসেবে তার সাধারণ ব্যবহার ও শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোকপাত করবো।

তার পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা নারীর "বিশেষ অধিকার" শীর্ষক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। এতে বিয়ে, তালাক, মাতৃত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার এবং সংক্ষেপে এও আলোচনা করবো যে, তার অধিকার ও দায়িত্ব কি ? আর এসম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা ও উপদেশ কি ?

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমঃ অধিকার

"মো'মেন পুরুষ ও মো'মেন নারী
এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ
দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, নামাজ কায়েম করে,
যাকাত আদায় করে, এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের
আনুগত্য করে। এরা সেসব লোক, যাদের উপর
আল্লাহর রহমত নাজিল হবেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ
সবার উপরে বিজয়ী ও মহাজ্ঞানী।"

আল-কোরআন ঃ (তওবা-৭১)

ইসলামে নারীর মানবাধীকার

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে অতীতের অনেক সভ্য সমাজেও তা ধর্মভিত্তিক হোক বা ধর্মহীন নির্বিশেষে,—নারীকে মানুষ বলে স্বীকার করা হবে কিনা তা দস্তুরমতো তর্কবিতর্কের বিষয় ছিল। তারা এ ধরনের প্রশ্ন তুলতো যে, 'নারীও কি পুরুষের মতো উপাসনা করতে পারে? 'নারী কি পুরুষের মতো পরকালীন জীবনে প্রবেশ করবে? একটি ব্যাপারে তাদের মতৈক্য ছিল যে, 'নারী হচ্ছে এক অপবিত্র জীব, একে শুধু পুরুষের সেবা ও মনোরঞ্জনের জন্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।, এ ধরনের আরো অনেক অর্থহীন ও নোংরা ধারণার শিকারে পরিনতি ছিল প্রাচীন পৃথিবীর পুরুষ সম্প্রদায়। এমন অমানবিক চিন্তাধারা ও কার্য্যকলাপ যখন চরম সীমায় পৌছায় তখনই নারী তথা সমগ্র নির্যাতীত মানবতার চিরমুক্তির পয়গাম নিয়ে দুনিয়ার বুইসলামের শুভাগমন ঘটে। ইসলাম প্রথমেই নারীজাতির অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে, তার দায়িত্ব ও কর্মক্ষেত্র নির্দ্ধারিণ করে, তার পূর্ণ মানবিক অধিকার বহাল করে এবং নারীকে এতো বেশী মর্যাদা দেয়া হয় যে, অন্যান্যরাতো রইলোই স্বয়ং সাহাবারা পর্যন্ত অবাক হয়ে যান। নারী জাতিকে হাজার হাজার বছরের শোষণ-নির্যাতন, অবিচার-বঞ্চনা ও অত্যাচার-অধীনতার নির্মম নাগপাশ থেকে পূর্ণ মুক্তি দেয়ার জন্যে ইসলামের এসব ঘোষণাও ত্বরিং পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য্য ছিল। ইসলাম নারীর পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধিকার দিয়ে তাকে পুরুষের বরাবর অধিকার ও ক্ষমতা দান করে। এভাবে নারীকে শতাব্দীর নিষ্ঠুর শোষণের আক্টোপাশ থেকে স্বাধীন ক'রে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুরুত্ব বহাল করে। এর চেয়েও বড় কথা, ইসলাম নারীকে সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশীদার গণ্য ক'রে তার উপর সমাজ-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করে। তার কর্মক্ষেত্র ও তার ভূমিকা পালনে সীমা নির্দ্ধারিণ ও করে দেয়।

নারীসমাজ যাতে তাদের উন্নত মর্যাদা বুঝে নিয়ে যথার্থ পথে অগ্রগতি অর্জন করতে পারে এবং নিজেদের হীনমন্যতা পুরানো বিভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির পথ খুঁজে নিতে পারে তার জন্যে ইসলাম সঠিক ও বাস্তবানুগ কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। এভাবে ইসলাম নারীকে সবদিক ও বিভাগে পুরুষের সমমানে উন্নীত করে। কোন ক্ষেত্রেই তাকে পুরুষের অধীনে বা পেছনে রাখা হয়নি। বলাবাহুল্য নারীর অধিকার ও মর্যাদা পুনর্বহালের সাথে সাথে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যও পুরুষের বরাবর করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরানের এই আয়াত থেকেই নারী-পুরুষের সমতার বিধান স্পষ্ট হয়ে যায়--

> "মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারী,—এরা সবাই একে অন্যের বন্ধু, (তারা) সততার আদেশ দেয় এবং মন্দের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে।" (তওবা ৭১)

ইসলাম ওসব গুণবৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুরুষের সাথে সাথে নারীকে শামিল করে নিয়েছে। নারী পুরুষ উভয়কে এমনভাবে সমন্বিত করে দেয়া হয়েছে যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে উভয় হচ্ছে একই সত্যের দুটি রূপ ও নাম মাত্র। আর এই উভয়ে সত্তাকে পরস্পর মিলিয়ে রাখার জন্যে দুটি মজবুত ও স্থায়ী বুনিয়াদও সরবরাহ করেছে। (১) ঔরসজাত সম্পর্কের ভিত্তি। (২) মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি। এই উভয় বুনিয়াদের মধ্যে নারী ও পুরুষের স্থান ও মান সম্পূর্ণরূপে বরাবর। পবিত্র কোরানে এই উভয় সম্পর্কের ব্যাপারে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে--

> "হে মানবজাতি! আমরা তোমাদেরকে একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদের জাতি ও গোত্র বানিয়েছি যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে আল্লার কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাবান সে-ই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু নিঃসন্দেহে, আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও সর্ব ব্যাপারে অবহিত। (আল হুজুরাত ১৩)

এই পবিত্র আয়াতে পুরো বিশ্বমানবতাকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে—তোমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ এক মাতা এবং এক পিতার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সামগ্রিকভাবে নারী পুরুষ পরস্পর ভাই-বোন। কারণ দুনিয়ার সব মানুষ একই আদি পিতার সন্তান। এদিক থেকে সব মানুষ পরস্পর আপন ভাই-বোনের মতোই। এ ব্যাপারে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদও (স) ইঙ্গিত করে বলেছেন—

"নারী পুরুষের সংগে সমসম্পর্ক যুক্ত।"

বলাবাহুল্য ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব যখন বরাবর তখন তাদের মধ্যে সমতা সৃষ্টি করাও অপরিহার্য; কেননা ছেলে মেয়ে উভয়ই মাতাপিতার ঔরসজাত সন্তান হিসেবে সমান গুরুত্বের অধিকারী।

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কেউ কারো চেয়ে বড় ছোট নয়। কারো মর্যাদা কারো চেয়ে বেশী কম নয়। নারী কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর দ্বিতীয় মর্যাদা হচ্ছে মানবিকতার ভিত্তিতে। এক্ষেত্রেও নারী পুরুষের মতোই সমমানের মানুষ। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন—

> "হে মানবজাতি! নিজ প্রতিপালককে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সত্তা থেকে তার জোড় বানিয়েছেন এবং সেই দুজন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সেই আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে নিজেদের অধিকার দাবী কর এবং আত্মীয়তা ও নৈকট্যের সম্পর্ককে নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, আল্লাহ তোমাদের তত্ত্বাবধান করছেন।" (নিসা-১)

এই আয়াত সম্পর্কে আমরা তিনটি বিষয় বিশ্লেষণ করবো—

(১) এই আয়াতে 'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর আগের আয়াতে লোকদের বলা হয়েছে যে আল্লাহতায়ালা একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে তাদের সৃষ্টি করেছেন।

'তাকওয়া' বা খোদাভীরুতা হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক গুণ। মানুষের ঔরসজাত সম্পর্ক বা অন্য কোন মানবিক সম্পর্কের সাথে এর কোন রকম মিল নেই। মানুষকে এই পৃথিবীর বুকে যে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তারই ভিত্তিতে তাদেরকে খোদাভীরুতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ সাধারণভাবে নারী ও পুরুষের সমষ্টিকেই বলা হয়ে থাকে। এ জন্যে খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বকে বাদ দেয়া বা আলাদা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। নিজের মানবিক গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের জন্যে নারীকেও অন্যান্য মানুষ অর্থাৎ পুরুষের মতো খোদাভীরুতা অবলম্বনের তাকিদ করা হয়েছে।

(২) "তোমাদেরকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে" প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বাক্যে ঔরসজাত সম্পর্কের পরিবর্তে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের অর্থই বেশী স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। কেননা ঔরসজাত সম্পর্কের জন্যে নারী ও নর দুজন মানুষের সমন্বয় একান্ত জরুরী "এক সত্তার" নয়। তাছাড়া আভিধানিকভাবে 'নফ্স' বা সত্তার অর্থ আত্মা অথবা মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণের দিকেই চিহ্নিত করে। এজন্যে এ থেকে অনর্থক বা নিছক ঔরসজাত সম্পর্কের অর্থ নেয়া যেতে পারে না।

(৩) আল্লাহতায়ালার এই বানী যে "সেই সত্তা থেকে তার জোড় বানিয়েছি" প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এই বাক্যটিও সাবেক দুটি কোরানী বাক্যের মতো মানব ঐক্যের তাকিদার্থে বলা হয়েছে। কারণ প্রথম বাক্যে এটা বলা হয়েছে যে পুরো বিশ্বমানবতাকে এক সত্তা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর তিনি হচ্ছেন আদি পিতা হযরত আদম। আর এর পরের বাক্যে তাঁর স্ত্রী এবং মানুষের আদি মাতা হযরত হাওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা সবাই তাঁরই সন্তান। বলাবাহুল্য যে, সন্তানদের মতো মাও মহা মানবতার বিকাশ ও মানব ঐক্যের বৈশিষ্ট্যে বরাবরের অংশীদার।

এ ব্যাপারে আমরা স্থির নিশ্চিত যে, কোরানের এইআয়াতে নারীর যে মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে তা দুনিয়ার সব জ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের সাম-

ষ্টিক জ্ঞানবুদ্ধির পক্ষেও সম্ভব নয় যা এতোটা তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক। ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যিক, দার্শনিক, এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিক থেকেও আয়াতটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য অনন্য—অসাধারণ।

এরপর এই মানবত্বের গুণ—যা আল্লাহ হযরত আদমের জন্যে নির্দ্ধারিত করেছেন—তা একটি অদৃশ্য জিনিস, তাকে বিভক্ত করা যেতে পারে না। আর এইগুণ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে—আদমের সন্তান হিসাবে। তা সে পুরুষ কিংবা নারী, তাতে কিছু আসে যায় না। এভাবে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কে একই মানবিক মর্যাদা দিয়েছে, এদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই যে, এরা কেউ নারী আর কেউ পুরুষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম নারীজাতিকে এই মানবিক অধিকার ও মর্যাদা তখন দিয়েছে যখন খৃষ্টান ও ইহুদী পন্ডিতদের সাথে সারা দুনিয়ার পন্ডিতরা "নারী—মানুষ না অমানুষ" এই নিয়ে তর্ক-বিতর্কের ঝড় তুলছিল।

এই দীর্ঘ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে—সব বুনিয়াদী ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমগুরুত্ব ও সমমর্যাদার অধিকারী। কেউ কারো থেকে খাটো নয়, হীণ নয়, পুরুষ ও নারীদের মধ্যেকার এই সমতাপূর্ণ অবস্থানকে সামনে রেখেই ইসলাম পুরুষদের মতো নারীদের জন্যেও আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা নারী সংক্রান্ত এসব ইসলামী শিক্ষা ও আইনবিধি নিয়ে আলোচনা করবো।

নারীর ধর্মীয় মর্যাদা

আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে, নারীর ধর্মীয় অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারটি তাকে খোদাভীরুতার উপদেশ দানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তার সামান্য কারণ হচ্ছে তার মানবিক বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি অর্থাৎ বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে তার দায়িত্ব ঠিক পুরুষেরই বরাবর এবং এ ব্যাপারে তাকে পুরুষেরই মতোই যোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এই কারণেই আল্লাহ যখন আদি মানব হযরত আদমকে বেহেশতে থাকার জন্যে বলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে বারন করেন তখন সেই আদেশ ও নিষেধের সম্বোধন আদিমাতা হযরত হাওয়ার প্রতিও ছিল, যেমনটি ছিল হযরত আদমের প্রতি। পবিত্র কোরানে এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

> "এবং হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ই এই জান্নাতে থাক, সেখানে যে জিনিষ তোমাদের মনে চায় খাও, কিন্তু ঐ গাছের কাছে যেওনা, নয়তো অত্যাচারীদের মধ্যে হয়ে যাবে।
>
> (আ,রাফ—১৯)

এরপর যখন আল্লাহতায়ালা তাদের অবাধ্যতার জন্যে ভৎর্সনা করেন তখনও উভয়কে একই সাথে সম্বোধন করেন—

> "আমরা কি তোমাদের উভয়কে ঐ গাছের নিকটে যাওয়া থেকে বাধা দিইনি?"

তাছাড়া ইসলাম নারী পুরুষের ক্ষমতার শুধু পয়গামই দেয়নি, বরং তাকে হাতে কলমে বাস্তবায়ন ও তার স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতা দানের উদ্দেশ্যে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আল্লার দরবারে জবাবদিহির উপলব্ধিও সৃষ্টি করেন। এর সাথে সাথে মহিলাদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিশেষ বাইয়াতের আয়োজনও করা হয় যেন তাদের এক

পৃথক মর্যাদা স্বীকৃত হয় এবং তারা যেন নিছক বাপ, ভাই বা অন্য কোন মানুষের চাপে পড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে। ইসলাম গ্রহণ করা সম্পর্কেও নারীদের পরিপূর্ণ ব্যক্তি স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

> "হে নবী! যখন তোমার কাছে মো'মেন নারী বাইয়াত করার জন্যে আসে এবং এ কথার শপথ নেয় যে সে আল্লার সাথে কাউকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, ব্যভিচার করবেনা আপন সন্তানকে হত্যা করবেনা, নিজ হাতপায়ের সামনে কোন মিথ্যা অভিযোগ বানিয়ে আনবেনা এবং কোন সৎকর্মের আদেশে তোমার অবাধ্যতা করবেনা--তাহলে তাদের বাইয়াত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"
>
> (মুমতাহেনা--১২)

মনীষী মোহাম্মদ সাহুত, তাঁর গ্রন্থ "নারী ও কোরান"-এ এই আয়াত সম্পর্কে বলেন--"নারীদের কাছ থেকে আলাদাভাবে বাইয়াত গ্রহণের অর্থ হচ্ছে ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে পৃথক এক স্থায়ী মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আল্লার দরবারে নিজেদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে।১

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে আখেরাতে একই ভাবে জবাবদিহি করতে হবে এবং উভয়ই পাপ বা পুন্যের ভিত্তিতে শাস্তি বা পুরস্কার অর্জন করবে। এ প্রসঙ্গে কোরানে অতি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে--

> "আর যে সৎকর্ম করবে—তা সে পুরুষ হোক বা নারী—যদি সে মো'মেন হয়, তাহলে এমন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের অনু বরাবরও অধিকার ক্ষুণ্ন হতে পারবেনা।"
>
> (নিসা--১২৪)

---

(১) নারী ও কোরআন পৃষ্ঠা-৩।

আল্লাহ্ আরো বলেছেন--

"মুনাফিক পুরুষ ও নারী এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহ্ জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে তারা চিরদিন অবস্থান করবে। সেটাই তাদের জন্যে উপযুক্ত স্থান। তাদের উপর আল্লার অভিশম্পাৎ রয়েছে এবং তাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।" (তওবা—৬৮)

অর্থনৈতিক অধিকার

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার বলতে ইসলামের কথা হচ্ছে সব রকমের ধনসম্পদ বা সম্পত্তিতে তার মালিকানার অধিকার এবং তার ইচ্ছে মতো ওসব ধনসম্পদ বা সম্পত্তি ব্যয় বা ব্যবহার করার পূর্ণ স্বাধীনতা। আমরা আগেই বলেছি যে নারী বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই আল্লার ইবাদত করার যোগ্য এবং সৎকর্মে তার ভূমিকা ও সহযোগিতা অপরিহার্য্য। সুতরাং এই যোগ্যতার প্রমাণ পেশ করার জন্যে এবং সৎকর্মে ভূমিকা পালনও সহযোগিতা দানের জন্যে তার অর্থনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা থাকা একান্তই জরুরী। অবশ্য এই উভয়বিদ অধিকারের জন্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও নীতিগত কোন পার্থক্যই নেই।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রোমান সমাজে নারীর নারীত্বের জন্যেই তার সব রকমের অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হতো। এভাবে আরব এবং অন্যান্য সভ্য এবং অর্দ্ধ সভ্য সমাজেও নারীর সব রকম অধিকার ও মর্যাদা হরণ করা হয়। তাদের দৃষ্টিতে নারী হয়ে জন্মানোটাই ছিল একটা বিরাট অপরাধ। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথেই নারী জাতিকে সবরকমের অধিকার ও মর্যাদা দানের সাথে সাথে ক্রয় বিক্রয় এবং সম্পদ ও সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা লাভের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া হয়। ইসলাম নারীর ব্যক্তিগত সম্পদ বা সম্পত্তি থেকে কোন পুরুষকে, এমনকি স্বামী, পিতা বা ভাইকেও, অনধিকার হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেয়না। ইসলাম নারীকে তার নিকটাত্মীয়দের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার অংশীদারীত্ব ও দান করেছে। অথচ পৃথিবীর অন্য সব জাতি নারীর এই অধিকারকে অস্বীকার করে, ফলে তারা কোন মৃত নিকটাত্মীয়ের সম্পত্তিতে

উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। নারী সমাজকে এই বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচিয়ে তার উত্তরাধিকারী সত্ব প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়ে আল্লাহ কোরানের এই আয়াত নাযিল করেন—

> "পুরুষদের জন্যে সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা মাতাপিতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে এবং নারীদের জন্যেও সেই ধনসম্পদে অংশ রয়েছে যা পিতামাতা এবং নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে--কম হোক বা বেশী, আর এই অংশ (আল্লার পক্ষ থেকেই) নির্দ্ধারিত রয়েছে।"
> (নিসা-৭)

কোরানের এই আদেশ মোতাবেক নারীরাও তাদের মাতাপিতা, ভাই, ছেলে, স্বমী এবং অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে যাওয়া ধনসম্পদের অংশ পেতে শুরু করে।

একইভাবে ইসলাম পূর্বযুগে নারীদেরকে তাদের বিয়ের দেনমোহর থেকেও বঞ্চিত করে রাখা হতো। বাপ, ভাই, স্বামী বা অন্য কোন পুরুষ তার দেন-মোহরের প্রাপ্য হজম করে যেতো। তার যৌতুক এবং উপহারগুলো সরাসরি স্বামীর দখলে চলে যেতো। মোটকথা কোন উপায়েই নারীকে ধনসম্পদের মালিক হতে দেয়া হতো না।

ইসলাম নারীর ওপর পরিচালিত এই অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটায় এবং তাকে তার ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কোন বাপ-ভাই বা স্বামীর জন্যে এখন নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার আর কোন অবকাশ নেই। মেয়েদের বিয়ের দেনমোহর সম্পর্কে কোরান স্পষ্ট বলেছে--

> "নারীদেরকে তাদের মোহর—যা তাদের অধিকার, দিয়ে দাও।"
> (নিসা-৪)

মনীষী ইবনে হাযম বলেন "শরীয়তের আইন মোতাবেক স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে বা প্রতারিত করে তার যৌতুক বা মোহর ছিনিয়ে খাবার অধিকার কোন স্বামীরই নেই। এমনকি স্ত্রীর মোহর যৌতুকের সামান্যতম অংশ ভোগ করাও

তার জন্য বৈধ নয়। যৌতুক ও মোহরের উপর পুরো অধিকার একচ্ছত্রভাবে শুধু নারীরই রয়েছে। নারী তার সম্পদ স্বামীর বিনা অনুমতিতেই যেমন ইচ্ছা ব্যবহার বা ব্যয় করতে পারে। এ ব্যাপারে স্বামীর আপত্তি করার কোন অধিকার নেই। তিনি আরো বলেন "কোন মেয়ের পিতার, তা সে প্রাপ্ত-বয়স্ক হোক বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ; স্বামীর ঘর করুক বা না করুক, এই অধিকার নেই যে সে তার মেয়ের মোহর থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করবে। পিতা বা অন্য কোন নিকটাত্মীয় যদি মেয়ের মোহরের কোন অংশ গ্রহণ করে তাহলে তা হারাম বা অবৈধ বলে গণ্য হবে। মেয়ে তার মোহর বা অন্য কোন ব্যক্তিগত সম্পদ যেখানে মর্জি, যেভাবে ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে ব্যয় করতে পারে ; এ ব্যাপারে পিতা-ভাই বা স্বামীর বলার কোন অধিকার নেই।"[১]

স্থাবর অস্থাবর সবরকমের ধনসম্পদের উপর নারীর পূর্ণ স্বাধীন অধিকার রয়েছে। এছাড়া ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনসম্পদ আয় উপার্জন করার পূর্ণ স্বাধীনতাও নারীর রয়েছে। নারীর জামানত দান বা প্রদানের অধিকারও আছে ; নারী উপহার দিতে বা নিতেও পারে। সে তার সম্পর্কে আপন নিকটাত্মীয় বা তার ইচ্ছেমতো অপর যেকোন মানুষকেও দান করার ব্যাপারে স্বাধীন। সে তার ধন সম্পদ যেকোন মানুষের জন্যে অসীয়ত করে যেতে পারে। ইসলামের আইন মোতাবেক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নারী সুবিচারের জন্যে আদালতে মামলা দায়ের করার অধিকারও রাখে। মোটকথা ইসলাম নারীকে সব রকমের পূর্ণ অধিকার ও মানবিক মর্যাদা দান করে। ইসলাম ছাড়া আর কোথাও নারীর এই অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত নয়। ইসলামের আগে নারী এসব অধিকার ও মর্যাদা থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত ছিল।

ইমাম মোহাম্মদ আবদুহু বলেন--"ইসলাম নারীকে এমন উন্নত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাকে যে অধিকার দান করেছে তা অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন। এতো অধিকার ও মর্যাদা যেমন জগতে নারী পায়নি তেমনি ইসলামী সমাজ ছাড়া বর্তমানে অন্য কোন সমাজেও নারীর এতো অধিকার ও

---

(১) আলমুহাল্লা--নবম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৭-১১

মর্যাদা স্বীকৃত নয়। ইসলাম ছাড়া অন্য কোন উপায়ে নারী ভবিষ্যতেও তার এতো মর্যাদা বা অধিকার পাবার আশা করতে পারে না। ইসলাম শত শত বছর আগে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার যে বিধান বাস্তবায়ন করেছে তা এতো উন্নতমানের যে, কোন মানুষের পক্ষে তার চিন্তা করাটাও মুশকিল।"

"আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ যেখানে নারীশিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য জ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারী প্রগতির বুলি আওড়ানো হয় সেখানেও নারীর যথার্থ অধিকার ও মর্যাদার আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়নি যা ইসলাম অনেক আগেই নারীকে দিয়ে রেখেছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে আজো এমন সব নারীবিরোধ আইন ও প্রথা প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে নারীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শোষণ করা হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরে পাশ্চাত্য জীবনের সর্বত্র নারী সংক্রান্ত এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে আজ পাশ্চাত্য সমাজে নারীর অবস্থা এমন করুণ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যা সম্ভবতঃ অন্ধকার যুগেও ছিলনা।"

এই বিশ্বখ্যাত গ্রন্থকার অন্য এক জায়গায় লিখেছেন—"পাশ্চাত্যের বর্তমান পন্ডিত সমাজ যারা নিজেদের দাবী মতো নারীকে অনেক বড় স্থান দিয়ে দিয়েছে বলে গর্ব করে আর উল্টো আমাদেরকেই সংকীর্ণমনা বলে কটাক্ষ করে; আজ ইসলাম থেকে আমাদের দূরে সরে পড়ার কারণে আমাদের যে অধঃপতন-এই জ্ঞানপাপীরা তাকে আমাদের দ্বীনের ফলাফল বলে দোষারোপ করছে।"

আমাদের সমাজে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী ব্যক্তিরা, যারা ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ তারা পশ্চিমা জ্ঞানপাপীদের সুরে সুরে মিলিয়ে ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে নানারকম ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য করে থাকে। ইসলামী চিন্তাবিদদের ব্যাপারেও এসব অন্ধ অনুসারীরা অভদ্র উক্তি প্রকাশ করে থাকে-তারা আসলে নিকৃষ্ট পর্যায়ের আহমক। পাশ্চাত্যের ঠুনকো চাকচিক্য তাদের দৃষ্টি ও বিবেকশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

সামাজিক অধিকার

ইসলাম নারীর সামাজিক অধিকারও দিয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত আইনবিধি প্রবর্তন করেছে—

(ক) মেয়ে যখন বালেগ অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হয় এবং তার জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ দেখা দেয়, সব বিষয় ও ব্যাপার ভাল করে বুঝতে শুরু করে তখন তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যাবতীয় অধিকার অর্জিত হয়ে যায়। এখন সে চাইলে পৃথক কোন বাসগৃহেও থাকতে পারে। এ ব্যাপারে তার আত্মীয়স্বজনের হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নেই, তাকে কেউ নিজেদের সাথে থাকার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। অবশ্য শর্ত হচ্ছে সে যেন সচেতন ও সজ্ঞান হয় যাতে নিজেই তার জানমাল ও ইজ্জত আবরুর নিরাপত্তা বিধান করতে পারে।

বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আহমদ ইব্রাহীম বলেন--"মেয়ে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয় তা সে বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা--তার অবস্থা যদি অসন্তোষজনক হয় তাহলে তার পিতা কিংবা অন্য কোন দায়িত্বশীলের এই অধিকার থাকবে যে সে তাকে নিজের কাছেই থাকার জন্য বাধ্য করবে কিন্তু মেয়ে যদি জ্ঞানী বুদ্ধিমতি ও আত্মমর্যাদাবান হয় তাহলে তাকে কাছে রাখার জন্যে বাধ্য করার অধিকার কোন দায়িত্বশীলেরই থাকবে না। অবশ্য বিয়ের পর মেয়ের এই অধিছার স্বাভাবিক ভাবেই শেষ হয়ে যায় এবং তার পক্ষে স্বামীর সাথে অবস্থান করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায় যেন সে তার দাম্পত্যের অধিকার ও দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করতে পারে। এটা এমন এক স্বাভাবিক কথা যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের কোন দরকার নেই।"

(খ) প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে তার ইচ্ছামতো বিয়ে করার অধিকার রাখে। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও বিয়ে দেবার অধিকার অন্য কারুরই নেই। যদি সে কোন চরিত্রবান ব্যক্তির সাথে বিয়ে করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাধা দেয়ার অধিকারও কারুর নেই, কারণ তা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং এটা হচ্ছে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই অধিকার সে প্রকাশ্য পন্থায় ব্যবহার করার স্বাধীনতা রাখে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স)-এর বাণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন--

> "কোন অলীর (দায়িত্বশীল) পক্ষে মেয়ের (ব্যক্তিগত) ব্যাপারে (হস্তক্ষেপ করার) কোন অধিকার নেই।" (আবুদাউদ)

প্রিয়নবী আরো বলেছেন--

> "বিবাহিতা নিজের ব্যাপারে "অলী" থেকে বেশীক্ষমতাপ্রাপ্তা। অবিবাহিতার ব্যাপারে অলী তার কাছে অনুমতি চাইবে এবং তার নীরবতাই অনুমতি।" (বোখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ)

আল্লামা ইবনে কাইউম এই হাদীসের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন--"বালেগা বুদ্ধি-প্রাপ্তাও জ্ঞানী মেয়ের ধনসম্পদেও যখন তার পিতা মেয়ের অনুমতি ছাড়া ব্যায়ের অধিকার রাখেনা সেখানে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার মর্জি ছাড়া তিনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? অথচ, ধনসম্পদ ব্যয়ের অধিকার, কোন অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিয়ে দেয়ার তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য ব্যাপার।" (জাদুল মায়াদ-চতুর্থ খন্ড)

কিন্তু এসব বিধিনিষেধের পরও যদি কোন দায়িত্বশীল নিজের মেয়েকে কোন অবাঞ্ছিত পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে মেয়ে সে বিয়েকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রাখবে। হাদীসে আছে যে—খান্সা বিনতে জুযাষকে তার পিতা এমন এক ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেন-যাকে তিনি পসন্দ করতেন না। উল্লেখযোগ্য যে তার প্রথম স্বামী ইন্তেকাল করেন। প্রিয়-নবী এই বিয়েকে নাচক করে দেন। (আল্ আহকাম আস্ শারয়ীয়াহ্)।

এজন্যে বিয়ের সময় মেয়ের উপস্থিতি একান্তই উত্তম। আহমদ ইব্রাহীম তাঁর আল আহকাম আস শরয়ীয়াহ গ্রন্থে আরো লেখেন যে, বিয়ে সম্পন্ন হবার অন্যতম শর্ত হচ্ছে পাত্র-পাত্রী উভয়ই স্বাধীন ও বুদ্ধিমান হবে, বিয়ের সময় উভয়ে উপস্থিত থাকবে অথবা উভয়ের উকিল, অথবা উভয়ের মধ্যে একজন স্বয়ং উপস্থিত এবং অন্যজনের উকীল উপস্থিত থাকবে। (আহকাম আস্ শরয়ীয়াহ। পৃষ্ঠা-৯)।

শায়খ আল্লামা মাহ্মুদ শাতুত এবিষয় সম্পর্কে বলেন—"এ সম্পর্কে আমরা যখন কোরানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি তখন দেখি যে, ইসলাম নারীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার সমর্থক। যেমন সূরা আহ্যাবের এই আয়াতে বলা হচ্ছে—

"আর সেই মো'মেন মহিলা যে নিজেই নিজেকে নবীর জন্যে হেবা করে দিয়েছে নবী যদি তাকে বিয়ে করতে চায়। এই বিশেষ সুবিধে শুধু তোমার জন্যে অন্যান্য মোমেনদের জন্য নয়।"

(আহযাব—৫০)

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে--

এরপর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেয়ার পর স্বামী তৃতীয়বার) তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সেই মহিলা এরপর তার জন্যে আর বৈধ থাকবে না অবশ্য যদি তার বিয়ে অন্য কোন পুরুষের সাথে হয় (এবং যদি তাকে তালাক দিয়ে দেয়)।

একই সূরায় এরপর বলা হচ্ছে--

"এরপর যখন তাদের ইদ্দত পুরো হয়ে যায় তখন ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রকাশ্য পন্থায় যা মর্জি তা করার স্বাধীনতা তাদের রয়েছে।" (বাকারা--২৩৪)

এসব আয়াতে স্পষ্টভাবে বিয়ের কর্ম নারীর মর্জির উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে দায়িত্বশীলের ভূমিকাকে গৌণ করা হয়েছে। এরপর একথা একেবারে বিবেকবর্জিত ও শরীয়ত বিরোধী মনে হয়, যে কোন ব্যাপারে অধিকার ব্যবহার করার জন্য সংশ্লিষ্ট জনের উপস্থিতি জরুরী হয় ঠিকই, কিন্তু সে যদি সেচ্ছায় কোন বিষয়ের মীমাংসা করতে চায় তাহলে তাকে অবৈধ গণ্য করা হবে। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়তের আইন মোতাবেক, যেকোন ব্যক্তিগত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার বালেগ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রের রয়েছে। আর ঠিক একই অবস্থা যদি নারীর বেলায় হয় তাকে অবৈধ বলার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। এছাড়া এটাও সন্দেহাতীত ব্যাপার যে বিয়ের পুরো সম্পর্কটাই স্বামী-স্ত্রীর মর্জির উপর নির্ভরশীল আর এটা সর্বজন স্বীকৃত নীতি যে যেকোন ব্যাপারে পুরো ক্ষমতা ও অধিকারের মালিক হতে পারে কেবল বিষয়-সংশ্লিষ্ট নরনারী।

(কোরআন ও নারী, পৃষ্ঠা ১২-১৩)।

তাঁর বক্তব্য অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট। এরপর আরো কিছু বলার মানে হবে সূর্যের সামনে বাতি জ্বালানোর মতো। উপরের বক্তব্যের মাধ্যমে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলাম নারীর স্বাধীন অভিমতকে কতোটা গুরুত্ব দেয় এবং ইসলাম নারীর মর্যাদা কতো বৃদ্ধি করেছে।

(গ) সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে অন্য যে অধিকারটি দিয়েছে তা সত্যিই অনন্য ও অভূতপূর্ব। আজকের তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও নারীকে এতোবড় অধিকার দিতে অপ্রস্তুত। অথচ এরাই নারীমুক্তির ব্যাপারে নিজেদেরকে ঠিকাদার মনে করে। নারীর এই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারটি হচ্ছে—শান্তি বা যুদ্ধের যেকোন সময় নারী ইচ্ছা করলে শত্রুপক্ষের যেকোন লোককে আশ্রয়দান করতে পারে।

হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর আবুতালেবের মেয়ে এবং হযরত আলীর সহোদরা বোন উম্মেহানী এক মুশরিক ব্যক্তিকে নিজ গৃহে আশ্রয়দান করেন। হযরত আলী বোনের দেওয়া এই আশ্রয়কে অগ্রাহ্য করে শত্রুটিকে হত্যা করার জিদ ধরেন। এমতাবস্থায় হযরত উম্মেহানী দ্রুত প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলেন যে, 'হে আল্লার রসূল, আলী এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছে যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি।' একথা শুনে প্রিয়নবী বলেন--

> "উম্মেহানী! আমরাও তাকে আশ্রয় দিচ্ছি যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।" (বোখারী, মুসলিম)

এ সম্পর্কে প্রিয়নবীর আরও একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী বলেছেন—

> "সব সবল মুসলমান দুর্বল মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষক। তাদের রক্ত সমগুরুত্বপূর্ণ এবং (কাউকে) আশ্রয় দেবার অধিকার তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

"মুসলমান" শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। ছোট-বড়-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যেকোন মানুষই মুসলমান হতে পারে। বলাবাহুল্য উম্মেহানী সম্পর্কিত হাদীসের মতো এই হাদীসটিতে দেয়া অধিকারও নারী-পুরুষ সবাই সমানভাবে পাবে। এখানে প্রিয়নবীর আরেকটি হাদীসে নারী সমাজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও গুণবৈশিষ্ট্য আরো স্পষ্ট হয়ে পড়ে। প্রিয়নবী বলেছেন—

"নারী পুরো জাতির দায়িত্ব নিতে পারে।" (তিরমিযি)

'আলমুলতাকা'র গ্রন্থকার এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—"নারী মুসলমানদের পক্ষ থেকে শত্রুকে আশ্রয় দিতে পারে।" এ প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার হাদীসটিও সিদ্ধান্তমূলক। তিনি বলেন—"যদি কোন মহিলা মুসলমানদের পক্ষ থেকে (শত্রুকে) আশ্রয় দিতে চায়—তাহলে দিতে পারে।" এই অনুমতির স্পষ্ট অর্থ এই যে, ইসলামী সমাজে নারীর এই কর্মকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যেকোন মুসলিম মহিলা এই অধিকার ব্যবহার করতে পারে। কোন ব্যক্তি মহিলাদের এই অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না।

যদিও এটা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং সামান্য অসতর্কতাতেও ভীষণ ভয়ংকর পরিণতি ঘটতে পারে; সুতরাং এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম এক্ষেত্রেও নারীর অধিকারকে অক্ষুন্ন রেখেছে। এথেকে অনুমান করা যেতে পারে যে ইসলামী সমাজে নারীকে কতোটা দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত মনে করা হয়। নারীকে এতো বেশী মর্যাদা দেয়া এবং বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল কেবল ইসলামই মনে করে।

আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজ নারীমুক্তির শ্লোগান তো খুব দিচ্ছে কিন্তু তারা নারীর বিবেকবুদ্ধি ও বিশ্বস্ততায় কক্ষনো আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। এর কারণ হচ্ছে পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিক গুণবৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে। ফলে সেখানে নারী-পুরুষের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। সেখানে প্রতিটি নর-নারী অপরাধে অভ্যস্ত এবং তারা সবাইকে নিজেদের মতো অপরাধী ও অবিশ্বাসী বলে মনে করে। সুতরাং পাশ্চাত্যসমাজে নারীর ওপর পুরুষের এবং পুরুষের উপর নারীর আস্থা স্থাপনের বিন্দুমাত্র অবকাশও নাই। এভাবে পাশ্চাত্য সমাজে পাক-

পবিত্রতা লজ্জা-শালীনতা ও নিঃস্বার্থ সেবার কোন অস্তিত্ব নেই, আর পারস্পরিক বিশ্বাসের তো সেখানে কোন প্রশ্নই উঠেনা। অন্যদিকে ইসলামী সমাজের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো পারস্পরিক বিশ্বাস-সদ্ভাব-শালীনতা, নিঃস্বার্থ সেবা অকপট মানবিকতা। ইসলামী সমাজে পারস্পরিক বিশ্বাস মর্যাদা ও বিশ্বাসের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—তা পাশ্চাত্য সমাজে একান্ত অকল্পনীয় ব্যাপার।

এর একটি কারণ হচ্ছে ইসলামী সমাজে উন্নতি ও মানমর্যাদার মান ধন-সম্পদ বা বংশভিত্তিক নয়—বরং এখানে নারী-পুরুষ ছোট-বড় সব মানুষই বরাবর মর্যাদার অধিকারী। কারো যদি বেশী মর্যাদা হয় তাহলে তা হয় কেবল খোদাভিরুতার জন্যেই। এখানে প্রত্যেকের আদর্শ-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই, একই মঞ্জিলের দিকে তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের পথ অতিক্রম করছে। এপথে যদি কোন আপদ-বিপদ আসে তাহলে তারা সম্মিলিতভাবে তার মোকাবেলা করে,—সবাই জানমালের ত্যাগ-তিতিক্ষায় এগিয়ে আসে।

ইসলামী সমাজে ধনী দরিদ্র, ছোট বড়, নারী পুরুষ সবাই সমান, সবাই বরাবর। এখানে ভেদাভেদ ও বৈষম্যের কোন অস্তিত্ব নেই। সমতাবোধ, পারস্পারিক বিশ্বাস ও আস্থা, সম্প্রীতি ও সদ্ভাব এবং নিঃস্বার্থ সেবা হচ্ছে মুসলিম সমাজের উল্লেখযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্য। এজন্যে ইসলামী সমাজের কোন নারীও যদি কারো জানমালের দায়িত্ব নেয় তখন গোটা সমাজ তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানায় এবং প্রত্যেকের মনেই তার জন্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতির ভাব জাগে।

সমাজ ও নারী

উপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে এটা ভাল করে জানা গেল যে ইসলামী সমাজে নারীর অধিকার কতটুকু। ইসলামী সমাজে নারীর ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে এবং এখানে নারী পুরো মানবিক সন্তুষ্টির সাথে মুক্ত মন ও স্বাধীন বিবেক নিয়ে জীবনযাপন করে। উল্লেখযোগ্য যে এসব হচ্ছে আল্লার পক্ষ থেকে দেয়া অধিকার যা

তিনি নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকেই দান করেছেন। এথেকেও এই নীতি যুক্তির বাস্তবতা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ্ পৃথিবীতে কোন জীব বা কোন পদার্থকেই অকেজো বা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করেননি এবং পৃথিবীতে উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটি জিনিষেরই মূল্য ও মর্যাদা নির্দ্ধারিত রয়েছে। পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে সেই মূল সত্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন

> "মুমেন পুরুষ ও মু'মেন নারী এরা-সবাই একে অপরের বন্ধু, সৎকর্মের আদেশ দেয়, মন্দ কর্মের প্রতিরোধ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা সেসব লোক যাদের উপর আল্লার রহমত নাযিল হবেই। নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ সবার উপরে বিজয়ী এবং মহাজ্ঞানী।"
>
> (তওবা--৭১)

পবিত্র কোরানের এই আয়াতে মানব জীবনের সব দিক ও বিভাগকে সামনে রেখেই স্পষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে কোন ধরণের বিশেষ গুণাবলীর সমন্বয় হলে পরে কোন ব্যাক্তি বা সমাজ যথার্থ উন্নতি অর্জন করতে পারে। এসব মহৎ গুণাবলীর অর্জন ও সংরক্ষণ করা প্রতিটি মুসলমানের বুনিয়াদী কর্তব্য কিন্তু যেহেতু আমরা নারী সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করছি তাই এই আয়াতের আলোকে নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছি।

ক) এই আয়াতে একটি দৃষ্টান্তমূলক সমাজ--যথার্থ ইসলামী সমাজের লোকদের গুণবৈশিষ্ট্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে একটি ইসলামী সমাজের সদস্যদের মধ্যে অবিভাজ্য সম্পর্ক মওজুদ থাকে। এখানে ব্যাক্তিকে সমাজ থেকে বা সমাজকে ব্যাক্তি থেকে পৃথক করে দেখার বা কোন একটাকে গৌণ মনে করার কোন অবকাশ নেই। আর এই সম্পর্কের বুনিয়াদ হচ্ছে সেই আধ্যাত্মিক মূল্য-

বোধ যার উপর পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করেই কোন মানুষ মুসলমান হতে পারে। এর মধ্যে প্রথম বিষয় হচ্ছে এক আল্লার অস্তিত্ব ও তাঁর গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। আর এই বিশ্বাসই হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের আসল বুনিয়াদ। কারণ ব্যক্তি ও সমাজের সবরকম সম্পর্ক আবেগ ও উপলব্ধির উপর নির্ভরশীল। আর এসব ইসলামী মূল্যবোধের উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের পরই এই সম্পর্ক হয় মজবুত ও স্থিতিশীল। এই সম্পর্ক এতই মজবুত যে তাকে ইস্পাত-কাঠন দেয়ালের সাথেই কেবল তুলনা করা যেতে পারে। সম্পর্কের এই দৃঢ়তা আসলে ঈমানেরই ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হয়। একে মেনে নেয়ার পর ব্যক্তি সমাজের এক দায়িত্বশীল সদস্যের মর্যাদা লাভ করে। এরপর ব্যক্তি তার ভালমন্দ সব কর্মের জন্যে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। আর এরই মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভালবাসার আবেগ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে জীবনের মহত্তম লক্ষ্যস্থল, যেখানে পৌঁছানোর জন্যে যেকোন মানুষ আকাংখা পোষণ করতে পারে। এই বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেছে—

"মোমেন পুরুষ ও মোমেন নারী সবাই একে অন্যের বন্ধু।"

এতে পরিষ্কারভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হলো যে, ইসলামী সমাজে নারী পুরুষের মর্যাদার মানদন্ড হচ্ছে ঈমান এবং এই ঈমান হচ্ছে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি।

(খ) যখন কোন সমাজের ভিত্তিই হয় 'ঈমান' তখন তার জনগণের মধ্যে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উভয় ক্ষেত্রে কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর সৃষ্টি হয়। আর তা হলো তারা সৎকর্মের আদেশ দেয়, মন্দকর্মের প্রতিরোধ করে। নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এখানে আমরা কোরানী আয়াতের শুধু সেই অংশের ব্যাপারে আলোচনা করবো যাতে নারীদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

"তারা সৎকর্মের উপদেশ দেয় এবং অসৎকর্মের প্রতিরোধ করে" এই খন্ড আয়াতের ব্যাপারে চিন্তা করলে জানা যায় যে আল্লাহ সমাজকে বিভেদ

বিশৃংখলা থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর একটি পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই দায়িত্বের ব্যাপারে নারী পুরুষের মধ্যে কাউকেই নিষ্কৃতি দেয়া হয়নি। আল্লাহ পুরো বিশ্ব-মানবতাকে সামনে রেখেই সম্বোধন করেছেন'—তাতে নরনারীর পৃথক সত্তার কোন গুরুত্ব নেই। নিঃসন্দেহে আল্লার পক্ষ থেকে এটা একটা বিরাট ও মহত্তম দায়িত্ব—যা নর-নারী উভয়কেই অবশ্য কর্তব্য হিসেবে পালন করতে বলা হয়েছে। বলাবাহুল্য ইসলাম ছাড়া অন্য কোন সমাজে নারীকে এতোবড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে করা হয়নি!

গ) "তারা সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্মের প্রতিরোধ করে" এই কোরানী আয়াতের মাধ্যমে মুসলিম নর-নারীর দায়িত্বকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সমাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোকে সর্বোতভাবে মজবুত ও স্থিতিশীল করা এবং যুলুম অত্যাচার, শোষণ-বঞ্চনা, প্রতারণা অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা ইত্যাদির অবসান ঘটানো তাদের বুনিয়াদী কর্তব্য হয়ে পড়ে। তারা সমাজকে এমন ভাবে গড়ে তুলবে যে সেখানে কোন একটি ব্যক্তিও যেন তার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত না হয় এবং কেউ যেন কোনভাবে কারো হাতে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বরং প্রত্যেকেই যেন পরস্পরের সহযোগী ও কল্যাণকামী হয়। তারা এমন সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি অত্যাচারের উচ্ছেদ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যে সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজকে বিভেদ বিশৃংখলা ও অরাজকতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এই মহত্তম দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারীও তার ক্ষমতা মোতাবেক সংগ্রামী ভূমিকা পালন করবে। এ দৃষ্টিকোন থেকে মুসলিম নারীকে তার কর্মসীমার আওতায় থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহন করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে সে তার সমাজ ও পরিবেশকে ভাল করে জেনে বুঝে নেবে এবং সমাজ ও পরিবেশের সবরকম ভাল-মন্দ সম্পর্কে তাকে অবহিত থাকতে হবে। এভাবেই মুসলিম নারী সমাজের বৃহত্তর অংগনে নিজেদের বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ সম্পর্কে প্রিয়

নবীর একটি বাণী অতি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রতিটি মুসলিম নর-নারীকে সম্বোধন করে বলেছেন—

"যে মুসলমান, মুসলমানদের ব্যাপারাদিতে আগ্রহ না দেখায়—সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

আর মুসলমানদের ব্যাপারাদী বিভিন্ন রকমের হতে পারে এবং স্থান ও সময়ের দিক থেকে তার পরিবর্তন পরিবর্ধনও ঘটতে পারে। কোন কোন মুসলমান চাষাবাদ ও কৃষি তৎপরতায়, কেউ কল কারখানা বা শিল্পকলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক বা সরকারী দায়িত্ব পালনে, কেউ ক্ষুধা ও দারিদ্রের অবসান প্রচেষ্টায়, কেউ সমাজে শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কারে, কেউ কেউ সামষ্টিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়, কেউ বিশেষ বা সীমিত পর্যায়ে, কেউ বৃহত্তর ও ব্যাপক পর্যায়ে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করে। কর্ম ও দায়িত্ব পালনের সবগুলো ক্ষেত্রেই নারীর কর্তব্যও ততটুকু যতটুকু পুরুষের। এভাবে সমাজের উন্নতির সাথে সাথে যদি আরো নতুন কর্মক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তাহলে পুরুষের মতো নারীও সেসব ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে।

এখানে মহিলাদের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা এবং তার ব্যবহারিক খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কারণ ইসলামের আলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের দাবী ও চাহিদা মোতাবেক নারী নিজেই তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবে। কারণ সময় ও পরিবেশের সাথে সাথে কর্ম-পন্থারও পরিবর্তন ঘটতে পারে। নীতি ও আদর্শ অপরিবর্তনীয় থাকলেই হলো।

অবশ্য এখানে আমরা নারীর স্বাভাবিক কর্মসীমা এবং তাদের তৎপরতার বিভিন্ন পর্যায়ের দিক নির্দেশ করবো যা তারা তাদের কর্মসীমায় থেকে গ্রহণ ও পালন করতে পারে। কিন্তু মূল আলোচনা শুরু করার আগে এখানে এমন একটি প্রশ্নের জবাব দেয়া প্রয়োজনীয় মনে করি, তাতে করে সামনের অনেক প্রশ্ন ও জটিল সমস্যাবলীর সমাধান সহজ হয়ে যাবে। আর তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী সমাজে নারীর কর্মক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে নারীকে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এমনি অসহায় ছেড়ে

দেয়া হয়নি, বরং নারীদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসীমা নির্ধারণের পিছনে গভীর ও ব্যাপক ভাবনা ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা রয়েছে এতে সমাজ সংস্কার উন্নতি ও অগ্রগতির এমন রহস্য নিহিত রয়েছে যাকে বাদ দিয়ে সমাজের যথার্থ অগ্রগতি ও কল্যাণের চিন্তাই করা যেতে পারেনা। এ জন্যে, কেউ যদি বলেন যে নারীর এই কর্মক্ষেত্র ও সীমা নির্ধারণ নিষ্প্রয়োজনীয় যাতে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে,—তাহলে তিনি ভুল ও যুক্তিহীন কথাই বলবেন। নারীদের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রকৃতি এবং তাদের দৈহিক ও মনস্তাত্বিক বাস্তবতাকে সামনে রাখলে যে কেউ—নারীদের ব্যাপারে ইসলামের বাস্তবভিত্তিক কর্ম-পন্থা নির্ধারণের যৌক্তিকতা বুঝতে সক্ষম হবেন। ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম নারীদের গঠনমূলক ও বিপ্লবী ভূমিকা সামনে রাখলেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমানিত হয়ে যাবে। অতীতের মুসলিম নারী সমাজ ও আজকের তথাকথিত আধুনিক নারী সমাজের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে আপনারা দেখতে পাবেন যে ইসলাম তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন বিকাশে কি বিরাট অবদান রেখেছে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রতিভার উন্মেষ এবং জীবনের বৃহত্তর অংগনে তাদের ভূমিকা ছিল গঠনমূলক ও বিপ্লবাত্মক। বুদ্ধিভিত্তিক ও চিন্তাগত দিক থেকেও মুসলিম মহিলারা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। আর তাঁরা এসব কিছু করেছেন ইসলামের নির্দ্ধারিত কর্মক্ষেত্র ও কর্মসীমায় পর্দার অন্তরালে থেকেই। পর্দার অন্তরালে থেকেও তাঁরা কখনো তাঁদের জাতীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সমস্যাবলীর সমাধানে নিজেদের বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অবহেলা করেননি বরং দুনিয়ার ইতিহাসে কেবল ইসলামী সমাজই একমাত্র উদাহরণ যেখানে মুসলিম নারী জাতির সাধারণ ও বিশেষ সমস্যাবলির সমাধানে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে- পারিবারিক, সামাজিক, যুদ্ধ সন্ধিতে শারীরিক ও মানসিক ভাবে তাঁরা তাদের এক একটি দায়িত্ব পালন করেন। সবক্ষেত্রেই তাঁরা পর্দার মধ্যে থেকেই পুরুষের বরাবর যোগ্যতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম মহিলাদের এই সক্রিয় তৎপরতা ও বীরত্বের সত্যতা ইসলামের চরম শত্রু এবং সমালোচকরাও অস্বীকার করেনি। ইতিহাস এই সত্যতারও সাক্ষী যে, মুসলিম নারী তার দ্বীন ও ঈমান এবং ইসলাম ও

মুসলমানদের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের প্রিয়তম স্বামী এবং যুবক ছেলে-দেরকেও জেহাদের মাঠে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের সব ধনসম্পদ জেহা-দের তহবিলে দান করে দিয়েছেন এবং স্বয়ং নিজেরাই রণাঙ্গণে গিয়ে মুজা-হীদদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবা করেন। আহতদের সেবা ও চিকিৎসার দায়িত্ব তাঁরাই পালন করেন। এভাবে শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ময়-দানেও মুসলীম নারী তাঁর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করেন। আজকের যুগের মুসলিম নারী ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বলে এবং তথাকথিত আধু-নিক চাকচিক্যের প্রতারণায় বিভ্রান্ত বলে আজ এতটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। আজকের মুসলিম নারী ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে তাদের সঠিক অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে একান্তই অজ্ঞাত এবং একই কারণে তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে।

অতীতের মুসলিম মহিলারা ইসলামী জ্ঞানে আলোক প্রাপ্তা ছিলেন বলে তারা ইসলামী শিক্ষার আলোকে—পর্দার অন্তরালে থেকে সমাজ ও জাতি-গঠনমূলক কাজ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে-ছেন দুনিয়ার ইতিহাস তার দ্বিতীয় কোন তুলনা পেশ করতে অক্ষম।

এখন আজকের যুগের নারীসমাজ যদি তাদের হৃত অধিকার ও মর্যাদা ফিরে পেতে চান তাহলে তাদেরকে তথাকথিত আধুনিক পাশ্চাত্যের অন্ধ অনু-সরণ, তার লাগামহীন বেলাল্লাপনা, অশালীন ও অশ্লীল কার্যকলাপ, দেহ প্রদর্শনী, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং এ ধরনের অন্যান্য নোংরা তৎপরতা বর্জন করে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে হারানো অধিকার ও মর্যাদা পুনঃরুদ্ধার করতে হবে।

বস্তুতঃ ইসলামী আদর্শের অনুসরণ তথা আল্লার নির্দেশিত কর্মপন্থার অনুসরণ করার মধ্যেই নারী-পুরুষ ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেদিন আমাদের মহিলা সমাজ এই বাস্তব কথা ও এই সত্য কথা অনুভব করে সামনে এগিয়ে আসবেন সেদিনই সত্যিকার অর্থে তাদের মুক্তির পথ সুগম

হবে। সেদিন তারা আর পুরুষের সাথে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে না এসে নিজেদেরই কর্মক্ষেত্র কর্মসীমায় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন এবং সেই পথ ধরেই তারা তাদের পরম লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশেষ অধিকার

প্রথম-পরিচ্ছেদ---বিবাহ
দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ—স্ত্রী সংখ্যা
তৃতীয়-পরিচ্ছেদ—তালাক
চতুর্থ-পরিচ্ছেদ—হালালা
পঞ্চম-পরিচ্ছেদ—নারী—মা ও স্ত্রী হিসেবে
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ--পর্দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

"এবং প্রতিটি জিনিষের আমরা জোড় বানিয়েছি। সম্ভবতঃ তোমরা তাথেকে শিক্ষা নেবে।" (আয-যারীয়াত-৪৯)

বিবাহ এবং প্রকৃতির বিধি

বিয়েশাদী, স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দ মানব স্বভাবের যৌন প্রবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে, এটা একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদা যা আল্লাহ মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এখানে আমরা যৌনবিজ্ঞানের কোন পরিভাষা বা বিভিন্ন যৌন-পর্য্যায়ের ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিনে বরং এর পেছনে সুপ্ত প্রাকৃতিক রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করবো এবং সহজ ভাষায় এটাকে আমরা "মানবস্বভাব" বলেই অভিহিত করবো। বিবাহ-বিধি আসলে বিশ্ব-প্রকৃতির সেই বিধান যার বন্ধনে আমাদের গোটা পরিবেশ আবদ্ধ রয়েছে। আর এর উপরই নির্ভরশীল রয়েছে মানববংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতা, এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন।

> "এবং সব জিনিষেরই আমরা জোড় বানিয়েছি; সম্ভবত; তোমরা এথেকে শিক্ষা গ্রহন করবে।"
>
> (আযযারীয়াত-৪৯)

আমাদের বিশ্বাস "সব জিনিষের" জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই। অবশ্য আমাদের ভাষা জ্ঞান ও পরিভাষার দৃষ্টিকোন থেকে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট সব প্রাণী ও জড় এবং আমাদের জানা অজানা বাকশীল ও বাকহীন সব জিনিষই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ আরো বলেছেন—

"পবিত্র সেই সত্তা যিনি সব রকমের জোড়া সৃষ্টি করেছেন তা সে পৃথিবীর বৃক্ষলতা হোক বা স্বয়ং তাদের নিজ অস্তিত্ব (অর্থাৎ মানব জাতি) অথবা ওসব জিনিষ যে সম্পর্কে এদের অবগতিই নেই। (ইয়াসীন : ৩৬)

মোটকথা এই বিবাহবিধি কোন এক শ্রেণী বা জাতির বিধানই শুধু নয় বরং দুনিয়ার সব মানুষ, জীবজন্তু-পশুপাখী, বৃক্ষলতাগুল্ম, জড় পাথর ইত্যাদি সব কিছুই এই বিধানের আওতাধীন রয়েছে। এ হচ্ছে গোটা দুনিয়ার স্বাভাবিক চাহিদা। এজন্যে আল্লাহতায়ালা প্রতিটি প্রাণী ও বস্তুর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক জোড়কে এমন ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যার সাথে অন্য কোন জাত বা শ্রেণীর কোন মিল নেই। এভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে প্রতিটি জাত ও শ্রেণীর প্রকার বিন্যাস করা হয়েছে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে পজেটিভ ও নেগেটিভ ব্যবস্থার মাধ্যমেও আমরা বিষয়টির বাস্তবতা অনুভব করতে পারি। নেগেটিভ তাদের মধ্যেকার গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীত আর এই বৈপরীত্যের মধ্যেই রয়েছে তাদের একতার মিল। উভয়ের মিলনের ফলেই আলোর সৃষ্টি হয়। আর প্রাকৃতিক বিধির অনুসরণ ছাড়া এই দুয়ের মিল কখনও সম্ভব নয়। যদি এদুয়ের মিলই না হয় তাহলে তাথেকে উপকৃত হবার কোন আশা করা যায় না। এভাবে দুনিয়ার অন্যান্য জিনিষের উদাহরণও একই রকম।

বিয়ে ও মানব স্বভাব

মানবজাতির প্রতিটি ব্যক্তি নর হোক বা নারী স্বাভাবিক নিয়মেই যৌনপ্রবণ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সঙ্গম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মানবিক পূর্ণতা অর্জিত হতে পারে না। এই সত্যতার উপর আলোকপাত করেই আল্লাহ বলেছেন—

"এবং তার নিদর্শনাবলী থেকে এটাও একটা যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীসমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের কাছে শান্তি অর্জন কর এবং (তিনি) তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিঃস-

নিশ্চয়ই এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে, যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (রূম ঃ ২১)

উপরের কোরানী আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যতা স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়। প্রথম কথা এই যে, স্ত্রীদের সৃষ্টি হয়েছে আমাদেরই নিজ অস্তিত্ব থেকে. অর্থাৎ উভয়কে একই উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে—এভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েই, অর্দ্ধেক মানুষ। উভয়ের মিলনই উভয়কে পূর্ণতা দান করে। দ্বিতীয় কথা হলো স্বামীর শান্তির উদ্দেশ্যেই স্ত্রীর সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ স্ত্রী হচ্ছে শান্তির প্রতীক। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, বিয়ের আধ্যাত্মিক ও মানবিক উপকার হচ্ছে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া।

এই তিনটি সত্যতার উপর চিন্তা করলে আল্লার সৃষ্টি রহস্যের বিভিন্ন দিক যেভাবে প্রসূত হয় তাতে আমাদের মন মগজ ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে, সুতরাং আমরা এসব উপলব্ধির ইতি টানতে পারি আয়াতের শেষ বাক্যাংশটির মধ্যেমে--

"নিঃসন্দেহে এর মধ্যে অনেক নিদর্শনাবলী রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা-ভাবনা করে। (রূম-২১)

এমনিতে বিধি সম্মত বিয়ের প্রচলন দুনিয়ার প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও চরিত্র, চেতনা এবং উপলব্ধির অসাধারণ শক্তিও দান করেছেন, আসলে এটাই হচ্ছে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরই ফলে প্রেম ভালবাসার আবেগ অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ একদিকে যেমন জৈবিক প্রবণতা ও প্রবৃত্তির অধিকারী তেমনি তাকে আধ্যাত্মিক গুণবৈশিষ্ট্য দান করে বিশেষ উন্নত মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বও দান করা হয়েছে। এই বিশেষ গুণ ও ক্ষমতা দানের মাধ্যমে তাকে সৎকর্ম বা অসৎকর্মের মধ্যে ভালমন্দ পার্থক্য করার বিশেষ জ্ঞানবুদ্ধিও দেয়া হয়েছে। মানবতার উপর আল্লার এটা বিশেষ দান যে তাকে একই সাথে জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্ জৈবিক দিক থেকে মানুষকে

নারী ও পুরুষে বিভক্ত করেছেন। এবং সামান্য দৈহিক পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়কে প্রায় একই ধরনের দৈহিক ও মানসিক কাঠামো দান করেছেন যাতে তারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ বুঝতে পারে।

আধ্যাত্মিকভাবে আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়কেই উন্নত ও মহত্তর গুণ বৈশিষ্ট্য দান করে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে নারী ও পুরুষ হিসেবে কাঠামোগত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মানবিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য বা বৈপরীত্য নেই। নারী ও পুরুষ উভয় একই গুণ ও মর্যাদার অধিকারী। দৈহিক কাঠামোর দিক থেকে নারী ও পুরুষ বৈদ্যুতিক তারের পজেটিভ ও নেগেটিভের মতো সাতন্ত্র্যের অধিকারী হলেও অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষের গুরুত্ব অভিন্ন বরাবর।

আমরা ইতিমধ্যেই নারী ও পুরুষের "জৈবিক বৈশিষ্ট্যের" পার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছি যে মানুষের মানবিকতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে নারীর কাছ থেকে শান্তি অর্জন করা। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন—

> "তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের অস্তিত্ব থেকে স্ত্রী সমূহের সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা শান্তি অর্জন কর।"
>
> (রূম-২১)

এস্থানে শান্তিটাকে পুরুষদের প্রাপ্যবিষয়ে পরিনত করার ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। আমাদের কোন কোন ব্যাখ্যাকার এর অর্থ যৌন তৃপ্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভাষাগত ধারার দিক থেকে এই অর্থ নেয়া যেতে পারেনা। বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই "শান্তিকে" আধ্যাত্মিক ও আন্তরিক শান্তির অর্থে গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া নিছক যৌন তৃপ্তিই যদি এর অর্থ হতো তাহলে তা কেবল পুরুষের প্রাপ্য বিষয়ই হবে কেন? কারণ যৌনতৃপ্তি তো নরনারী উভয়েই অর্জন করে থাকে। কিন্তু আয়াতে শুধু এক পক্ষকে অন্য পক্ষের কাছ থেকে শান্তি অর্জনের কথা বলে আসলে আধ্যাত্মিক শান্তি অর্জনের ব্যাপারই স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে দৈহিক যৌনতৃপ্তির অর্থ অপ্রাসঙ্গিক। এটা এ জন্যেই বলা

হয়েছে যাতে করে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। তাহলো স্বামী-স্ত্রীর যৌবন ঢলে পড়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে এক অনবদ্য আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠে। জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে যখন উভয়ের মধ্যে সবরকম যৌন কামনা-বাসনার সমাপ্তি ঘটে তখন তাদের মধ্যে এক নতুন হৃদ্যতা গড়ে উঠে যা স্বামী-স্ত্রীর শেষ জীবনকে করে তোলে প্রশান্ত-মধুর, আর এই সম্পর্ক এতই স্থিতিশীল হয়ে উঠে যে দুনিয়ার কোন শক্তিই তার মাধুর্যকে নষ্ট করতে পারে না। এ ছাড়া আয়াতে বর্ণিত শান্তি অর্জনের যে ফলাফল দেখানো হয়েছে তা বংশ বিস্তার নয় বরং ভালবাসা ও দয়া। এ থেকেও তার আধ্যাত্মিক দিক ভেসে উঠে। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা, বিবাহের উপকারিতা বুঝিয়েছেন যে এতে করে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা এবং দয়া সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। এভাবে আল্লাহ মানুষকে মানবিকতার সাথে মিলাতে চান এবং তাদের মধ্যে এতটুকু নৈকট্য প্রতিষ্ঠা করতে চান যে তারা চিন্তা-ভাবনা ও মনমানসিকতার দিক থেকে একাত্ম হয়ে যাবে। আর এভাবেই তাদের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা ও দয়া-সহানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে। আল্লার এই বাণী মোতাবেক মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে থেকে উৎসারিত এই প্রেম ভালবাসা এবং দয়া ও সহানুভূতি একান্তই অপরিহার্য।

এটা একটা স্পষ্ট বাস্তব কথা যে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম ও মিলন একান্তই জরুরী। একাকী ওদের কেউই সেই স্নেহ মমতা ও উদার মননশীলতার অধিকারী হতে পারে না যা সন্তান লালন পালনের জন্যে সহায়ক প্রমাণিত হয়ে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর এই মিলন স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত। তাই আল্লাহ এটাকে বৈবাহিক বিধির আকারে আমাদের প্রক্রিয়ারাধীন করেছেন। এথেকে সেই শান্তি অর্জিত হয় যা পূর্বর্ণিত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটা এমন এক বাস্তব সত্য যাকে ইসলাম বিবাহের মাধ্যমে বাধ্যতা-মূলক করেছে এবং প্রত্যেকের জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, বর্ণিত উপকার লাভের জন্যে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে যার দিকে আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তা মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানজনক করে দেয়া হয়েছে এবং তাতে করে সমাজে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে কোন কোন লোক স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধান প্রয়োজনের বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আপত্তিও তুলে থাকে। অথচ সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের আপত্তির মূলে মূর্খতাই সংগোপন থাকে। কারণ বিয়ের উদ্দেশ্য শুধু যৌন তৃপ্তি অর্জন করাই নয় বরং এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের মধ্যে এক ধরনের আন্তরিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তারা প্রেম-প্রীতির বন্ধনে একত্ব হয়ে যায়। এটাই সৌন্দর্য্য, এটাই শান্তি এবং এটাই তৃপ্তি, কোরানী আয়াতের মাধ্যমে উপরে এই সত্য বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে।

বিয়ে ও সামষ্টিক স্বভাব

মানুষ এক সামাজিক জীব, কিন্তু তার আত্মা ও ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি তাকে সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছে। মানুষের মধ্যে সামষ্টিক জীবনযাপনের এবং সমাজকে সংগঠিত ও অগ্রগতির দিকে টেনে নেয়ার অসাধারণ আবেগ কার্য্যকরী থাকে যা অন্য কোন জীবের মধ্যে দেখা যায় না। মানুষের এই আবেগ অনুভূতিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী-রাসুল ও সংস্কারকদের পাঠিয়েছেন। এঁরা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্ককে সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় করেন। আর প্রাচীন অতীত কাল থেকে আজকের এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত—এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সঠিক পন্থায় সুদৃঢ় করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে পারিবারিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। পারিবারিক সম্পর্ক ব্যক্তি ও সমাজের উপর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ইতিবাচক প্রভাব রাখে এবং এটাই হচ্ছে অত্যন্ত ফলপ্রসূ ব্যবস্থা।

বিয়ের সবচেয়ে বড় উপকারিতা হচ্ছে এই যে মানুষ তার যৌন বাসনা পূরণের জন্যে একটি সীমারেখা তৈরী করে নেয়। এর পর সে অন্যের সীমায় যায় না। এভাবে সে তার স্বাভাবিক কামনা বাসনাকে এক নির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত করে এবং নিজেকে নিজে কিছু বিধিনিষেধের আওতাধীন করে নেয় যাতে অন্যের মানমর্যাদা অক্ষুন্ন ও নিরাপদ থাকতে পারে। এটা নিঃসন্দেহে এক পবিত্র কর্ম। এই পবিত্র কর্ম সম্পাদন ক'রে সে নিজের সামাজিক জীবনকে করে সাফল্যমন্ডিত।

বিয়ের দ্বিতীয় উপকার হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা ও সহযোগিতার বিকাশ। তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক তাদেরকে পরস্পরের সাথে সাহায্য সহযোগিতার বন্ধনকে করে মজবুত। দয়া-প্রেম ও সাহায্য সহযোগিতার অনুভূতির মাধ্যমে তারা সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্যে ত্যাগ তিতিক্ষার ভাব উন্মেষিত হয়।

বিয়ের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রেমের আবেগে উদ্বেলিত স্বামী-স্ত্রী যখন পরস্পরের সাথে মিশে তখন তাদের মধ্যে কোনরকমের লৌকিকতা বা ইতস্ততাবোধ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে তারা অকৃত্রিম প্রেমের অন্তহীন অন্তরীক্ষে মুক্ত কপোত কপোতির মতো বিচরণ করে। এবং এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তানের জন্ম হয় তার প্রতি তাদের যৌথ ভালবাসার কোন সীমা থাকে না। তারা তাদের অকৃত্রিম ভালবাসার ফসলের জন্যে জীবনের যে কোন ত্যাগ-তিতিক্ষার জন্যেও প্রস্তুত থাকে। এভাবে স্বাভাবিক ও সুস্থ পারিবারিক পরিবেশে গড়ে উঠা সন্তানই সমাজের সৎ ও সক্রিয় সদস্যে পরিণত হয়। এভাবেই সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজের গোড়াপত্তন হয়—যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতা করে ও সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে কাজ করে।

পারিবারিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য আরেক উপকার হচ্ছে—ব্যক্তি বিয়ের আগে নিজের স্বার্থেই আয় ও ব্যয় করে। বিয়ের পর এবং সন্তান অর্জনের পর তার মনে উদারতার সৃষ্টি হয়। এখন সে শুধু তার নিজের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে না বরং পত্নী ও সন্তানের সুখ-শান্তির কামনায় সে আরো সক্রিয় হয়ে উঠে, এতে তার মধ্যে ইতিবাচক ও গঠনমূলক আবেগ ও

আনন্দ বৃদ্ধি পায়। আর এই জিনিষটিই হচ্ছে সুস্থ ও সুন্দর সামাজিক জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর।

বিয়ে ও যৌন প্রবৃত্তি

পুরুষ ও নারীর মধ্যেকার দৈহিক গঠন পার্থক্যের বিশ্লেষণ করলে বিশেষ করে নারীর প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সৃষ্টার দৃষ্টিতে নর ও নারীর যৌন তৃপ্তির বিষয়টি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং বিয়েশাদীর আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে মানববংশ বিস্তারের ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং তা এমন পন্থায় ক্রম বিকাশ দান করা যাতে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। যৌন তৃপ্তি অর্জনটা কোন রকমের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়, আসলে তা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের পথে এক পরিতৃপ্ত অনুভূতি লাভের উপায় মাত্র।

এটাও একটা বাস্তব সত্য কথা যে মানুষ, বিশেষ করে নারীকে সন্তান প্রজনন ও তার লালনপালনে যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। নারী সমাজের এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তার কোরানে বলেন—

> "আমরা মানুষকে উপদেশ দিয়েছি যে তারা তাদের মাতা-পিতার সাথে সততাপূর্ণ ব্যবহার করবে। তার মা কষ্ট-স্বীকার করে তাকে পেটে ধারন করেছে এবং কষ্ট স্বীকার করেই তাকে জন্ম দিয়েছে এবং তার গর্ভধারন ও দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত ত্রিশ মাস লেগে গেছে।" (আহ্কাফ ঃ ১৫)

মানুষ স্বাভাবিকভাবে আরামপ্রিয়, এই কারণেই সে দুঃখ কষ্টকে ভয় করে এবং এড়িয়ে চলতে চায়। যদি এই কর্মে তার জন্যে আনন্দের আকর্ষণ না থাকতো তাহলে তার প্রতি চিরবিমুখ হবার জন্যে তার প্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল যথেষ্ট। এজন্যে আল্লাহ্ নর-নারীর মধ্যে বিশেষ আকর্ষণ দিয়ে রেখেছেন এবং মিলনের ভাবনাই তাদের মধ্যে আনন্দঘন উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং মিলনের তাড়নায় তারা অস্থির হয়ে উঠে। যদি তাদের মধ্যে আল্লাহ্ এই বিশেষ আকর্ষণ ও আবেগ উত্তেজনার সৃষ্টি না করতেন তাহলে বংশ বিস্তারের ধারা ব্যাহত হয়ে পড়তো। এজন্যে আল্লাহ তাঁর কোরানে বলে দিয়েছেন যে—

"এখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের সাথে রাত্রিযাপন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে যা বৈধ করে দিয়েছেন তা অর্জন কর।" (বাকারা ঃ ১৮৭)

এখানে কোন কোন ব্যাখ্যাকার "অর্জন করা" অর্থ বংশবিস্তারের অর্থে গ্রহণ করেছেন। (প্রমাণের জন্যে তিব্‌রী, করতবী ও বয়জাবী শরীফ দ্রষ্টব্য।)

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা মহাপ্রকৃতি ও মানবসমাজের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা ভিত্তিক আলোচনা করেছি। এবার আসুন আমরা বিয়েশাদী সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও নীতি পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। এ ব্যাপারে কোরানের দিকে ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, কোরআন বিয়েকে পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ বলে ঘোষণা করে এবং এটাকে মানুষের যৌন-তৃপ্তি অর্জনের সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর উপায় বলে অভিহিত করে। এ সম্পর্কে কোরানের একটি বাণী হচ্ছে—

"তোমার আগেও আমরা অনেক রাসুল পাঠিয়েছে, এবং তাদেরকে আমরা স্ত্রী ও সন্তানের অধিকারী বানিয়েছি।" (রায়াদ ঃ ৩৮)

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স) বলেছেন—

"চারটি বিষয় হচ্ছে নবীদের ঐতিহ্য—এর মধ্যে একটি হচ্ছে বিয়ে।" (মসনদ এ আহমদ, তিরমিজী।)

প্রিয়নবী বিয়েকে--"দ্বীনের অর্দ্ধেক" বলে তার গুরুত্বকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন--

"যখন বান্দা বিয়ে করে নেয় তখন এভাবে যেন সে তার দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে।"

পবিত্র কুরআনে আরো ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে

"তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসী-দের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও।" (নুর ঃ ৩২)

বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম কারতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্য প্রসঙ্গে বলেন,—"যার বিয়ে হয়নি তার বিয়ে করিয়ে দাও কারণ লজ্জাস্থানের নিরাপত্তার জন্যে এটাই পবিত্র ও উত্তম উপায়।"

নবীন যুবকদের প্রতি বিয়ের আহবান জানিয়ে প্রিয়নবী বলেন—

> "হে নবীনগণ! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করতে সক্ষম তাদের বিয়ে করে নেয়াই উচিৎ, আর যারা তার ক্ষমতা রাখেনা তারা বেশী করে যেন রোযা রাখে কারণ রোযা যৌনবাসনা খর্ব করার উত্তম উপায়।" (বোখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসের মর্মার্থ এই যে, যদি কোন ব্যক্তি অতিশয় যৌন উত্তেজনা অনুভব করে এবং তার বিয়ে করার মতো ক্ষমতাও থাকে—অর্থাৎ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব নিতে পারে তাহলে সে যেন বিয়ে করতে বিলম্ব না করে। কিন্তু এমন ব্যক্তি যদি স্ত্রীর ব্যয়ভার বহনে অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার যৌন উত্তেজনা প্রশমনের জন্যে বেশী বেশী রোযা পালনের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। এতে করে তার স্বাভাবিক যৌনবৃত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে ইমাম ইবনে হাজম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতে সক্ষম ব্যক্তির জন্যে বিয়ে করা ফরয, যদি কোন সচ্ছল সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে না করে থাকে তাহলে সে ফরয কর্তব্যে অবহেলার জন্যে পাপের ভাগী হবে অন্য এক পক্ষের মতে বিয়ে ঠিক ফরয না হলেও ওয়াজিব অবশ্যই।

ইসলামে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও তাগিদে বিয়ের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাতো জানা হলো। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মগুরু 'সেন্ট পল' কি অস্বাভাবিক কথা বলেছেন একটু ভেবে দেখুন। তিনি বলেন, "আমি চাই বিশ্বের সব মানুষ আমারই মতো জীবন যাপন করুক (অর্থাৎ সবাই অবিবাহিত থাকুক) অবিবাহিতা বা বিধবা মহিলাদের জন্যে আমার পরামর্শ হচ্ছে বিয়ে না করাই তাদের জন্যে উত্তম।" এর কারণ দর্শাতে গিয়ে সেন্ট পল বলেন "অবিবাহিত ব্যক্তি সবসময় তার প্রভুকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে আর বিবাহিত ব্যক্তি সবসময় নিজের স্ত্রীর চিন্তাতেই বিভোর থাকে।" আর এই যুক্তি তিনি বিবাহিতা বা অবিবাহিতা মহিলাদের প্রসঙ্গেও দিয়েছেন যে, "বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীকেই প্রধান গুরুত্ব দেয় এবং প্রভুকে গৌণ

গুরুত্ব দেয় অথচ প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনকেই তার প্রধান গুরুত্ব দেয়া উচিৎ।" সেন্টপলের মতে পুরুষ যদি তার যৌন প্রবনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে বিয়ে করতে পারে কিন্তু তা উত্তম নয়। সেন্টপল বলেন—"কোন নারীকে পাওয়ার ইচ্ছাই মনে পোষণ করোনা। কিন্তু যদি তুমি বিয়ে করেই ফেল তা যেকোন উর্বশীর সাথেই করনা কেন—তাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বন্ধ করে হয়ে যায় এবং তাদের জীবন আবর্জনাময় হয়ে যায় এবং আমি তোমাদের ব্যাপারে সেই অশংকাই করি।"

এর অর্থ হলো, সেন্টপলের মতে বিয়ে করার ইচ্ছে করাটাই অনুচিত, কারণ তাতে খোদার স্মরণে অবহেলা আসে। তাই তিনি বিয়েকে উত্তম পন্থা মনে করেন না (তাঁর এই কথা কতটুকু যুক্তিসংগত বা মানব প্রকৃতি ও স্বভাবের সাথে এর কোন মিল আছে কিনা তা সত্যিই জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন। তাছাড়া সেন্টপলের কথা মতো যদি বিয়েশাদীর স্বাভাবিক পন্থা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মানববংশ বিস্তারের বৈধ পন্থা কি হবে ? এতে করে কি সামাজিক উচ্ছৃংখলা এবং যৌন ব্যাভিচার ও অনাচার বাড়বেনা ? যেমন পাশ্চাত্যের খৃষ্টান সমাজে আজ বলাৎকার মহামারীর রূপ ধারণ করেছে ?

বিয়ের নীতি ভঙ্গ—তার প্রভাব ও ফলাফল

[১] সক্ষমতা সত্ত্বেও বিয়ে না করা পাপ।

পবিত্র কোরান ও হাদীসের শিক্ষা মোতাবেক বিয়ে হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন এতে করে বৈধ উপায়ে মানুষের স্বাভাবিক যৌন তৃপ্তি অর্জিত হয়, আর বিয়ে হচ্ছে পরিবার ও সমাজের বুনিয়াদ। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যেকার প্রেম প্রীতি ভালবাসা ও সহযোগিতার বুনিয়াদও হচ্ছে বিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানব অস্তিত্বের স্থায়ীত্বের জন্যে বিয়ে জরুরি। আর কেবল বিয়ের মাধ্যমেই যেকোন মানুষ তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা ও শালীনতা অক্ষুন্ন রাখতে পারে। বিয়েকে অস্বীকার করার মানে হচ্ছে মানবতার মূল অস্তিত্ব এবং তার বিকাশকেই অস্বীকার করা, এর যাবতীয় সুফল থেকে

ব্যক্তি ও সমাজকে বঞ্চিত করা এবং স্বভাবকে তার গলা টিপে হত্যা করা। এরপরও যদি কোন সক্ষম ব্যক্তি বিয়ে করা থেকে বিরত থাকে তাহলে তার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে লোকটা শয়তানের দরজার আহমক ও মূর্খ। জীবনের উদ্দেশ্য ও চাহিদা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই নেই। প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স) জীবনের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন--

"যে ব্যক্তি সম্পদশালী হয় এবং বিয়ে করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(বায়হাকী)

অবিবাহিত জীবন ও তার অপকারিতা

প্রাচীন সমাজে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে অপূর্ণ মনে করা হতো এবং তাকে খোদার নৈকট্য লাভের অযোগ্য মনে করা হতো। সুতরাং সে যুগের সাধু ব্যক্তিরা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্যে সংসার-ধর্ম বর্জনকে জরুরী মনে করতো। তারা সব রকমের পার্থিব তৎপরতা থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়ে খোদার ধ্যানে মগ্ন হয়ে পড়তো। এই জন্যে তপ্-জপ্ কারী ব্যক্তি বিয়েশাদীর ঝামেলায় পড়তে চাইতো না। কেননা তাদের মতে, এতে করে মানুষের আবেগ উজ্জীবিত হয়ে উঠে এবং মানুষ সংসারমুখী হয়ে পড়ে।

কিন্তু ইসলাম প্রাচীন অন্ধকার যুগের সেই বাতিল ও ভুল ধারণাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করে দেয় এবং বিয়েকে পবিত্রতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের উত্তম মাধ্যম বলে ঘোষণা করে। প্রিয়নবী এ সম্পর্কে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেন—

"যে ব্যক্তি আল্লার সাথে পূর্ণ পবিত্রতার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহী তার স্বাধীন মহিলাদের সাথে বিয়ে করা উচিৎ।"

এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, খৃষ্টানধর্ম তার প্রথম যুগে অর্থাৎ ঈশা (আ)-এর আমলে, কক্ষনও বিয়ে বিরোধী ছিলেন না, অনেক পরে জানিনে তাদের পন্ডিত সমাজ কোথা থেকে এটা আবিষ্কার করে বসলো যে,

"বিয়ে খোদার নৈকট্য লাভের অন্তরায়"। সুতরাং তারা তাদের ব্যক্তিগত ধারণাকে ধর্মের নামে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পায়। তারা কিছুদিন পর্যন্ত বিয়েকে আবশ্যকীয় গণ্য করার ব্যাপারে ইতস্ততা প্রকাশ করতে থাকে। প্রথম যুগে বিয়ে করা বা না করার ব্যাপারে সব খৃষ্টান স্বাধীন ছিল। কিন্তু চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে আলফিরা নামক খৃষ্টানদের একটি ক্ষুদ্র দল স্পেনে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এবং এর মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম নেতাদের উপর আইনগতভাবে বিয়ে করতে নিষেধ করে। এ সময় খৃষ্টান বৈরাগী সন্ন্যাসীদের সংখ্যা এতো বৃদ্ধি পায় যে তারা কেউ গীর্জায় গীর্জায় এবং কেউ বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে আস্তানা গাড়ে। এর মাধ্যমে তারা যৌন প্রবণতাকে দমন করে খোদার নৈকট্য লাভের পথ খুঁজে। ইসলামের আবির্ভাবের পর সংসার বৈরাগীদের সেই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা হয় এবং খোদার নৈকট্য লাভের সেই অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে,-

> "এবং সন্ন্যাসবাদ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করে নেয়, আমরা তা' তাদের উপর ফরজ করিনি।" (হাদীদ ঃ ২৭)

প্রিয়নবী (স) ও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—

> "ইসলামে বৈরাগ্যের কোন অস্তিত্ব নেই।"

প্রিয় নবী (স) মুসলমানদেরকে সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যবাদী পন্থা থেকে বিরত রাখেন। এজন্যে প্রিয়নবীর (স) প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ সুন্নাতকে অস্বীকার বা অমান্য করার কোন বৈধতা থাকতে পারে না। অন্যদিকে প্রিয়নবী সন্ন্যাসবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ইঙ্গিত করে ঘোষণা করেন—

> "আমার উম্মতের সন্ন্যাস হচ্ছে হিজরত, পাপ ও মন্দ কর্ম থেকে হিজরত; জিহাদ, রোযা, নামায, হজ এবং উমরা।"
> (বোখারী ও মুসলিম)

প্রিয়নবীর (স) জীবদ্দশায় কিছু লোক তাঁর ইবাদাতের নিয়ম জানার জন্যে এলো। যখন তাদেরকে প্রিয়নবীর (স)ইবাদাতের পদ্ধতি সম্পর্কে বুঝানো হলো। তখন তারা এটাকে অপর্যাপ্ত ভেবে বললেন—তিনিতো নবী, তাঁর সব গুনাহই ক্ষমা করা হয়েছে অতএব আমাদেরকে আমাদের বিষয়ে ভাবতে হবে। তাদের

একজন বললো—আমি তো সারারাত নামায আদায় করবো। অন্য একজন বললো—আমি অব্যাহতভাবে রোযা পালন করবো। তৃতীয়জন বললো—আমি জীবনে বিয়েই করবো না। প্রিয়নবী যখন একথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাদের কাছে এসে বললেন—

> "তোমরা এমন কথা বলেছ ! শোন, আল্লার শপথ, আমি তোমাদের চেয়ে বেশী নিজ প্রতিপালককে ভয় করি এবং সবচেয়ে বেশী খোদাভীরু কিন্তু আমি রোযা রাখি আবার রাখিনাও ; রাতে নামায পড়ি আবার পড়িনাও, নিদ্রাও যাই এবং মহিলাদের সাথে বিয়েও করি এবং এটাই আমার সুন্নাত। যারা আমার সুন্নাতকে উপেক্ষা করবে তারা আমার নয়।"

যৌন নৈরাজ্য ও তার কুফল

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেসব লোকদের বিষয়েও আলোচনা করলাম যারা বিয়েকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা বিরোধ মনে করে বর্জন করে থাকে। এখন আমরা সেসব লোকদের ব্যাপারে আলোচনা করবো যারা ব্যাভিচার ও নিত্য নতুন যৌন বিলাসিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার আশংকায় বিয়ের পথ পরিহার করে। তারা মনে করে বিয়ে করলে পরে তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে যৌন সম্ভোগ করতে পারবে না।

ব্যাভিচার ও যৌন বিলাসিতার এই ঘৃণ্য প্রবণতাকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহিত করেছে আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা। আর এর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ইউরোপ ও আমেরিকা। ওসব পাশ্চাত্য দেশ গুলোতে তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতার আড়ালে যুবক যুবতিদের যথেচ্ছ যৌন অনাচার সৃষ্টির পথ করে দিয়েছে। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতার দর্শন ও শিক্ষা মোতাবেক মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধন-সম্পদ, যশ, খ্যাতি এবং এসবকে উন্নতির মানদন্ড মনে করা হয়। আধুনিক জড়বাদী সভ্যতা আধ্যাত্মিক তথা নৈতিক চারিত্রিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এবং এখানে শ্লীলতা ও শালীনতার কোন স্থান নেই। লজ্জাশরমের চিন্তা এখানে একান্তই গৌণ। প্রতিটি মানুষ এখানে লাগামহীন-

স্বাধীন, যার যা মর্জি সে তা করতে পারে—ব্যাস. দেশ ও জাতির স্বার্থবিরোধী কোন কাজ না করলেই হোল। এই লাগামহীন ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে গোটা পাশ্চাত্যে অবাধ যৌন নৈরাজ্যের এক অপ্রতিরোধ্য সয়লাব এসে পড়ে পাশ্চাত্যের প্রতিটি ব্যক্তি এমনকি বড়বড় নামকরা লোকেরাও আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী লোকেরা নিজেদেরকে স্ত্রী-পরিবার ও সমাজের বন্ধন থেকে মুক্ত মনে করে বেশ্যা-পতিতা ও আধুনিকা কলগার্লদের সাথে যৌন নৈরাজ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি তাদের বিবাহিত নরনারীরাও প্রকাশ্যভাবে অন্য নরনারীদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে মৌমাছি যেমন এক ফুলের রস চোষার পর অন্য ফুল ধরে—পাশ্চাত্যের নরনারীরাও তদ্রূপ। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন দেহই তাদের যৌন কামনার বস্তু আর তার জন্যে দরকার হলে কাউকে নাহক খুন করতেও তাদের বিবেকে বাধে না।

এই ঘৃণ্য যৌন স্বেচ্ছাচারীতার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থা তার পুরো কাঠামো সহ ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। ইউরোপ আমেরিকায় এই অবক্ষয় চলছে বেশ কয়েক যুগ থেকে আর তা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েই চলছে। তাদের এই পাপাচার ও নৈরাজ্যের ঢলে শুধু তারাই ডুবছেনা বরং তাদের অন্ধ অনুকরণকারী অন্যান্য দেশের জনগণও ডুবে মরছে।

অধুনা পাশ্চাত্যের কোন কোন পরিণামদর্শি চিন্তাবিদ আজ-কাল আশংকার শেষ সতর্ক ঘন্টা বাজাতে শুরু করেছেন। তারা বলছেন যে, পারিবারিক ব্যবস্থার অবসান ঘটলে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অন্য কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকবেনা। তাদের মর্মান্তিক পরিণাম অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত চিন্তাবিদ মার্শাল বেটান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিজের জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন—"নিজেদের ভুলভ্রান্তিকে ভাল করে মেপেজোপে নাও,কারণ তোমাদের পাপ অপরাধের পাল্লাকেই

অধিকতর ভারী দেখাচ্ছে, তোমরা নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধকে পদদলিত করেছ। যৌন নোংরামীর পেছনে তোমরা বেপরোয়া ছুটে চলছো, এখন দেখতে থাক যে তোমাদের যৌন নোংরামী তোমাদেরকে কোন্ নিয়মের মুখোমুখি করে দিচ্ছে।

ইসলাম, গোটা বিশ্বমানবতাকে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোর জন্যে, তাদের যথার্থ শিক্ষিত ও সুসভ্য বানাতে, তাদের সত্যিকার মানবতার পথ দেখাতে এবং তাদেরকে আসল আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে—সেই উচ্ছৃংখল নোংরামীর উৎসকেই বন্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম যৌন নোংরামীতে অভ্যস্ত নারী ও পুরুষের জন্যে এমন কঠোর শাস্তির বিধান করেছে যার কল্পনা করলেও তাদের লোমহর্ষণ জাগবে। এমনকি কোন কোন অবস্থায় যৌন অপরাধের জন্যে প্রাণদন্ড দানের বিধানও রয়েছে। ইসলাম সমাজকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন এবং প্রত্যেক মানুষের মান-মর্যাদার নিরাপত্তা বিধানের বৃহত্তর স্বার্থে এই জরুরী আইন বিধি প্রবর্তন করেছে। এতে করে সাধারণ মানুষ যৌন অপরাধীদের পাশবিক হামলা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে জীবনযাপনের সুযোগ পাবে।

এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম এই কঠোর শাস্তি নিছক দুজন অপরাধীকে এই জন্যেই দেয়না যে, তারা কিছুক্ষণের জন্যে অবৈধ স্ফূর্তিতে মেতে উঠেছিল, বরং সমাজকে সেই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচানোই তার আসল উদ্দেশ্য. যা এই যৌন অপরাধের ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা ও তার ক্ষতিকর প্রভাব

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে চিন্তাধারার ধ্বজাধারী তা তার নিজের কথায় চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং বস্তুগত আরাম-আয়েশ—এই দুটি বিষয়কেই তারা পুরো মানবগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য বলে বলতে চায়। আর এই উদ্দেশ্যে তারা যেকোন পদক্ষেপ গ্রহনের জন্যে তৈরী। পশ্চিমা সভ্যতার পতাকাবাহীরা কোন নীতি-চরিত্রের ধার ধারেনা বা এমন কোন ঈমান-বিশ্বাসকে

বিবেচনাযোগ্য মনে করে না যা তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। তারা যা দেখেনা-তা মানে না।

পাশ্চাত্যের এই বস্তুপূজারীরা কোন অদৃশ্য সত্তার শক্তিকেও স্বীকার করে না; তাদের কোন রিযিকদাতা, কোন সৃষ্টা বা মালিক বা মৃত্যুর পর কারো দরবারে উপস্থিত হতে হবে বলে বিশ্বাসকেও তারা অবিশ্বাস করে। সৃষ্টা যে তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, জীবন-যাপনের অবলম্বন দান করেছেন; সুখ-দুঃখ আর বিপদ মুসীবতে, অথবা চরম নৈরাশ্যের অবস্থায় মানুষকে যে, কোন মহান শক্তি সাহায্য-দয়া করেন—তাও তারা স্বীকার করে না। তারা এই বাস্তবতাকেও স্বীকার করে না যে দুনিয়ার যেসব প্রানীকে তাদের সৃষ্টা আহার যোগান এবং তাদের জীবনধারণের সব আয়োজন স্বাভাবিকভাবে করে রেখেছেন ; মোটকথা প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচরে কোন অস্তিত্বকে, কোন শক্তিকে, কোন সৃষ্টাকেই তারা বিশ্বাস করে না, স্বীকার করে না।

এই অবিশ্বাস আর অস্বীকারই হচ্ছে তাদের স্বার্থপ্রীতি আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম নৈরাশ্য ও উদ্বেগের মূল কারণ। বস্তুগত দিক থেকে সবকিছু পেয়েও যে তারা অসন্তুষ্ট ও বিচলিত-অস্থির এবং বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াই যৌনসম্ভোগের যে পাশবিক প্রবণতা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় তার কারণও সে একই। এমতাবস্থায় তারা বিয়ের সম্পর্কস্থাপনে রাযী হবে, তাকি চিন্তা করা যায় ?

আসলে পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীরা এক দুরারোগ্য মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে, যা তার রোগীকে কেবল বিয়ে করার স্বাভাবিক পথ থেকেই রুখছেনা বরং তার মানবিক অস্তিত্বকেও বিকৃত করে ছাড়ছে। এতে করে তারা সৎভাবে জীবনযাপনের পদ্ধতি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। এটা এমন অনস্বীকার্য্য সত্য-কথা যার ব্যাপারে যুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে। এই ভুল ও বিকৃত বুনিয়াদের উপর কোনদিন কোন সততাপূর্ণ সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। বস্তুতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যতই চাকচিক্যময় বলে মনে হোক না কেন আসলে তার ভিত্তি খুবই ঠুনকো, খুবই নড়বড়ে। এথেকে কোন প্রকৃত সুফলের আশা করা যায় না।

পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার সৃষ্ট নানারকম জটিল ব্যাধির একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে তারা জেনেশুনে কথায় ও কাজে আল্লার অস্তিত্ব এবং আল্লার দ্বীনের উপর কার্যকরী বিশ্বাস স্থাপন করবে। একমাত্র ঈমানই তাদেরকে সকল দুষ্কর্ম ও তার ক্ষতিকর প্রভাব এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে। ঈমান তাদেরকে এই অনুভূতিও দান করবে যে, এই ধনসম্পদ সবকিছু অস্তবেলার ছায়ার মতো—যা এক নির্দ্ধারিত আইন মোতাবেক সব মানুষের কাছে পৌছে এবং কেউ শুধু ততটুকুই পাবে যা তার প্রতিপালক তার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। এসম্পর্কে মানুষের সৃষ্টা স্পষ্টতই বলেছেন-

> "এ তো যুগের উত্থানপতন মাত্র, যা আমরা মানুষের মধ্যে আবর্তিত করতে থাকি।" (আলে ইমরান : ১৪০)

প্রকৃতপক্ষে ঈমানই হচ্ছে সেই আলো যা থেকে আশার কিরণ প্রস্ফুটিত হয়। এখানে দুষ্কর্ম ও দুশ্চিন্তার কোন স্থান নেই। এখানে নেই কোন নৈরাশ্য, কোন অরাজকতা আর কোন বিশৃংখলা। এ ব্যাপারে কুরানের একটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতে বড়ড যৌক্তিকতার সাথে মানুষকে সুকৃতির জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

> "তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিয়ে করিয়ে দাও। তারা যদি দরিদ্র হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ নিজ দয়ায় তাদেরকে ধনী করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদার ও মহাজ্ঞানী।"
> (নূর : ৩২)

কুরানের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকর ইবনে কাসীর এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন- "যে অবিবাহিত, তোমরা তার বিয়ে করিয়ে দাও এবং এ ব্যাপারে দারিদ্র বা অভাব অনটনের ভিত্তিতে বিলম্ব করা ঠিক নয় কেননা সব ব্যাপারে আল্লার উপর ভরসা করা উচিত এবং তিনি নিজেই উদারতা ও বদান্যতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

(ইবনে কাসীর তৃতীয় খন্ড)

বলাবাহুল্য এটা আল্লার প্রতিশ্রুতি এবং সব মুসলমান আল্লার প্রতিশ্রুতিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী ও পূর্ণ আস্থাবান। আল্লাহ যে তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন তাতে কোনরকম সন্দেহ নেই। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রা) প্রায়ই বলতেন যে-"তোমাদেরকে আল্লাহ বিয়ে করার যে আদেশ দিয়েছেন তোমরা তা পূরণ কর; আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।" এ ভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) বলেন—"আমি অত্যন্ত বিস্মিত যে, লোকেরা বিয়ে করে ধনী হচ্ছে না কেন, অথচ আল্লাহ বলেছেন—'তারা যদি দরিদ্র হয় তাহলে আল্লাহ নিজ দয়ায় ধনী করে দেবেন।'

এই বিস্তারিত আলোচনার পর আমরা বিয়ে না করার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আরো সতর্ক করা নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে বিয়ে ছাড়া কোন সমাজই বিপথগামীতা ও ব্যাভিচার থেকে মুক্ত হতে পারে না। কেবল বিয়ের মাধ্যমেই সমাজে সততা ও পবিত্রতার পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এরই মাধ্যমে আসতে পারে প্রকৃত সুখ ও সমৃদ্ধি। আল্লাহ এসব গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তির জন্যে সমৃদ্ধি দানের প্রতিশ্রুতি দেন। এর পরিপন্থী পথে চলে, সমাজ নৈতিক চারিত্রিকভাবে দেউলিয়ে হয়ে এবং বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হবার পরেও চরিত্রহীন ও অবিশ্বাসী লোকেরা নিজেদেরকে বড় অভাবী ও অসন্তুষ্ট মনে করে। বস্তুতঃ ঈমানই মানুষকে প্রকৃত সম্পদ ও সন্তুষ্টি দেয় আর ঈমান ছাড়া কেউ কোটিপতি হলেও জীবনের সুখ-শান্তি ও সন্তুষ্টি থেকে সে বঞ্চিত থাকে। ঈমানদার মানুষের সমাজকে বলা হবে সৎ ও সুস্থ সমাজ আর ঈমানবিহীন সমাজকে বলা হবে নোংরা শয়তানী সমাজ। এই উভয় সমাজের তুলনা করে আল্লাহ বলেন—

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে উৎসাহিত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজ ক্ষমা ও দয়ার প্রত্যাশা দেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত উদারহস্ত ও মহাজ্ঞানী।" (বাকারা ঃ ২২৮)

———

বিয়ের নির্বাচন

স্ত্রী-নির্বাচন

যখন কোন ব্যক্তি একথাকে খুব ভাল করে জেনে বুঝে নেয় যে বিয়ের নীতি এক অপরিহার্য নীতি ও বিধি এবং এটা তার স্বভাবেরই চাহিদা—তখন প্রকৃত অর্থে সে বাস্তব সত্যতা অনুভব করে নেয়। আর এ ভাবে সে সেই পন্থার খোঁজ পেয়ে যায় যা তাকে ইহকাল ও পরকালের জীবনে সাফল্যমন্ডিত করে।

বিয়ের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা, বৈধ ভাবে যৌন তৃপ্তি অর্জন এবং স্নেহ-ভালবাসা, সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সেবা ভিত্তিক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলা। এ জন্যে একজন উত্তম স্ত্রী কেবল সেই নারীই হতে পারে যে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ রয়েছে এবং উত্তম পন্থায় তার স্ত্রীসুলভ দায়িত্ব পালনে সক্ষম, নীতি, চরিত্র ও জ্ঞান বুদ্ধিতে হবে সে নারী আদর্শস্থানীয়া। সুতরাং এমন স্ত্রী নির্বাচন করা উচিত যার অন্তর হবে ঈমানের আলোকে উজ্জ্বল এবং কথায় ও কাজে হবে যথার্থ মুসলিম। যার চরিত্র হবে উন্নত, যে শিক্ষায় ও সভ্যতায় হবে সুন্দর, শ্লীলতা-শালীনতা, পবিত্রতা ও আত্মমর্যাদার ব্যাপারে যে হবে সচেতন ও সুজাগ।

ধন সম্পদের মান

সমাজে এখন অনেক লোক দেখা যায়, যারা জীবনের আসল সুখ সমৃদ্ধি সম্পর্কে অজ্ঞাত। তারা মূর্খতা বশত : সব সময় অন্যের ধনসম্পদ ও টাকা-কড়ির দিকে লালসার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে এবং বিয়ের মাধ্যমে ধনসম্পদ ও টাকা পয়সা পেতে চায়। এরা কেবল ওসব পাত্রীর অনুসন্ধান করে বেড়ায়

যেখান থেকে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বলাবাহুল্য লালসার এই দৃষ্টিকোন একান্তই নীতি বিরোধী এবং এতে করে কোনদিন দাম্পত্য জীবনের সুফল পাওয়া যায়না। এতে করে বিয়ের উদ্দেশ্য ও পূর্ণ হয়না। এ ধরনের লোভী ব্যক্তি সামান্য স্বার্থের জন্যে জীবনের আসল সুখসম্পদ থেকে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর একটি (স) বাণী অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ। তিনি বলেছেন—

"তোমরা ধন-সম্পদের ভিত্তিতে নারীদের বিয়ে করো না, কেননা এতে করে তাদের অবাধ্য হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে।"

(ইবনে মাজা, বায়হাকী, বাযযার)

বংশমর্যাদা

কোন কোন লোক পাত্রীর বংশমর্যাদা বা সমাজে তার পরিবারের সম্মান বা প্রভার প্রতিপত্তির দিকে গুরুত্ব দেয়। তারা শুধু সেই মেয়েকেই বিয়ে করতে চায়, যার বংশ মর্যাদা বা পারিবারিক প্রভাব রয়েছে। কিন্তু এটাও চরম ভ্রান্তিপূর্ণ প্রথা। এ ধরণের মানসিকতা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। তারা হয়তো জানেনা যে এই পার্থিব মান-মর্যাদার কোন গুরুত্ব নেই। এটা খুবই ঠুনকো মর্য্যাদা। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

"যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে বংশ মর্যাদার ভিত্তিতে বিয়ে করে আল্লাহ্ তাকে আরো নিকৃষ্ট করে দেন।"

(সর্বজন স্বীকৃত সহীহ হাদীস)

রূপ-নকসা

আবার কোন কোন ব্যক্তি তাদের পাশবিক মনোবৃত্তির ভিত্তিতে মেয়ের বাহ্যিক রূপ-নকসাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। এরা বাহ্যিক রূপেরই মোহগ্রস্থ। আসল রূপ ও সৌন্দর্য্য সম্পর্কে এরা কিছুই জানেনা অথবা রূপ-সৌন্দর্যের অর্থই তারা বুঝেনা। নারী মানুষ মাত্র। আর মানুষের

প্রকৃত রূপ ও সৌন্দর্য্য হচ্ছে তার মানবিক বৈশিষ্ট্য। যার চরিত্র-ব্যবহার উত্তম এবং যার অন্তরের রূপ ও সৌন্দর্য্য আছে—আসলে সেই হচ্ছে প্রকৃত রূপসী ও সুন্দরী। প্রিয়নবী (স) স্ত্রী নির্বাচন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন—

> "দ্বীনদার নারীর সাথে বিয়ে করো, তোমার কল্যাণ হবে।
> (বোখারী ও মুসলিম)

এক ব্যক্তি প্রিয়নবীর (স) কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো—"আমি এমন এক মহিলাকে পছন্দ করি যে খুবই সুন্দরী রূপসী এবং উচ্চ পরিবারের মেয়ে কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো ? "প্রিয়নবী (স) তাকে সেই বিয়ে করতে নিষেধ করলেণ। লোকটি আরেকবার এসে সেই একই প্রশ্ন করলো ; প্রিয়নবী আবারও নিষেধ করলেন। লোকটি তৃতীয়বার প্রিয়নবীর (স) কাছে একই প্রশ্ন নিয়ে এলে প্রিয়নবী (স) তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন—

> "প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান উৎপাদনে সক্ষম মহিলার সাথে বিয়ে করো--আমি যেন রোজ হাশরে তোমার জন্যে গর্ব করতে পারি।"
> (আবু দাউদ, নাসাই)

এখানে বিশেষজ্ঞরা "প্রেমময়ী" বলতে এমন চরিত্রবতী ও ঈমানদার মহিলাকে বুঝানো হয়েছে যে তার স্বামীকে মনে প্রাণে ভালবাসবে।

স্বামী-নির্বাচন

একজন যথার্থ স্বামীর যোগ্যতা ও মান নির্ভর করছে তার চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলীর উপর। এজন্যে স্বামী নির্বাচনের সময় নারীকে তার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গীর চারিত্রিক ও ঈমানী বৈশিষ্ট্যকে সামনে রাখতে হবে। প্রকৃত ঈমানদার এবং চরিত্রিক ব্যক্তিই উত্তম স্বামী হবার যোগ্য। এছাড়া যারা ধন সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য্য ইত্যাদিকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তারা আসলে নিজেদের হীন মানসিকতারই পরিচয় পেশ করে। নারীর বিবেচনার জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, লোকটি সুস্থ ও চরিত্রবান মানুষ কি না। আর পুরুষের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট গুণ হচ্ছে তার খোদাভীরুতা। ইসলামের

দৃষ্টিতে সবচেয়ে যোগ্য ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হচ্ছে ঈমানদার ও পরহেযগার ব্যক্তি। এ সম্পর্কে কোরানে বলা হচ্ছে—

> "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মানী আল্লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্‌কে ভয় করে।"
>
> (আলকোরান)

এ জন্যে যে ব্যক্তি ঈমানদার, চরিত্রবান, শিক্ষিত, মিষ্টভাষী, ভদ্র এবং পরোপকারী সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি—তা তার পারিবারিক ও বংশ মর্যাদা যাই হোক না কেন, তার দেহের বর্ণ যাই হোক আর তার পেশা যাই হোক না কেন—সে যেকোন পরিবারের যেকোন মেয়ে সাথে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র এই বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে মহামানবতার মুক্তিদূত প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স) নারী জাতিকে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন—

> "যখন তোমাদের কাছে এমন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব আসে যে সভ্য ও চরিত্রবান তাহলে তার সাথে বিয়ে করে নাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে বিভেদ বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।"
>
> (তিরমিজি)

স্বামী নির্বাচনে নারীর অধিকার

নারী-তা সে অবিবাহিতা হোক, বা তালাকপ্রাপ্ত হোক অথবা বিধবা সে তার বিবাহের জন্যে উত্থাপিত যেকোন প্রস্তাব গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন। কোন মেয়ে বা মহিলাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেয়ার অধিকার তার পিতা, ভাই বা কোন দায়িত্বশীল কারোরই নেই। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর হাদীস অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেছেন—

> "স্বামী-পরিচিতা নারীর বিয়ে তার অনুমতি অর্জন ছাড়া দেয়া যাবেনা।"
>
> (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "কুমারীর (মেয়ের) বিয়ে তার অনুমতি ছাড়া দেয়া যাবেনা।" এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, আমি প্রিয় নবীকে বললাম—

"কুমারী মেয়েতো লজ্জা করে, সে কিভাবে অনুমতি দেবে? প্রিয়নবী (স) জবাব দিলেন তার নীরবতাই হচ্ছে অনুমতি।"

(বোখারী-আবু দাউদ-তিরমিযী)

অর্থাৎ মেয়ের কাছে যদি অনুমতি চাওয়া হয় এবং সে তাতে চুপ করে থাকে--কোন রকমের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে তাহলে সেটাকে অনুমতি গন্য করা হবে কিন্তু যদি বিধবা বা তালাক প্রাপ্তার বিয়ে তার পরামর্শ ও স্পষ্ট ভাষায় অনুমতি ছাড়া করে দেয়া হয় তাহলে বিয়ে বাতিল হয়ে যাবে। অন্যদিকে কুমারী মেয়ের থেকে যদি (স্পষ্ট ভাষায়) অনুমতি না নেয়া হয়ে থাকে তাহলে বিয়ের পর সেই বিয়েকে ভঙ্গ করা অথবা ঠিক রাখার ব্যাপারে তার স্বাধীনতা থাকবে।

বিধবা নারীর ব্যাপারে অনুমতির যুক্তিপ্রমাণ হযরত খানসা বিনতে খাদ্দামের (রা) ঘটনা থেকে নেয়া হয়েছে,—যখন তার পিতা তার দ্বিতীয় বিয়ে দেন তখন তিনি সেই বিয়েকে অপছন্দ করেন। অতএব তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (স) সেই বিয়েকে নাকচ করে দেন। আর কুমারী মেয়ের অনুমতি সম্পর্কিত ব্যাপারে যুক্তি প্রমাণ নেয়া হয়েছে—

"একবার প্রিয়নবীর (স) দরবারে একজন কুমারী যুবতী এসে বললো—তাকে তার পিতা এমন জায়গায় বিয়ে দিচ্ছে যা তার পছন্দ নয়। তখন প্রিয়নবী (স) তাকে এই অধিকার দেন যে সে চাইলে বিয়েকে বহাল রাখতে পারে অথবা বিয়ে ভঙ্গ করে দিতে পারে।"

(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

এভাবে অন্য আরেক মেয়ের উল্লেখ রয়েছে। মেয়েটি প্রিয়নবীর (স)কাছে এসে বললো "হে আল্লার রাসুল। আমার পিতা আমার বিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে করে দিয়েছেন। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (স) মেয়েটিকে অধিকার দিলেন যে, "চাইলে তা বহাল রাখ, চাইলে তা ভঙ্গ কর"। এরপর মেয়েটি বললো যে, আমি আমার পিতার সিদ্ধান্তকে বহাল রাখছি।

কিন্তু আমি এই প্রশ্ন মহিলাদেরকে একথা জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে করেছি যে, তাদের ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকদের কোন ক্ষমতা নেই।"

(বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী. ইবনে মাজা, নাসাই)

এভাবে মানবতার ইতিহাসে প্রথম ও শেষ বার মহিলারা এতবড় অধিকার ও মর্যাদা পেলো। ইসলাম তাকে এই ক্ষমতা দিলো যে সে তার বিয়ের ব্যাপারে আগত প্রস্তাব সমূহকে ইচ্ছা করলে গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করে দিতে পারে। অথচ ইসলামের আগে কোন নারীর গ্রহণ বা বর্জনের কোন রকম অধিকার ছিলনা। তখন তার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো পুরুষরাই। তার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন দাম ছিলনা। বাজারের পণ্য সামগ্রীর মতো যেকোন পুরুষ তাকে ক্রয়-বিক্রয় করতো।

বিয়ের প্রস্তাব

আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ের আগে বিয়ের প্রস্তাব বা পয়গাম পাঠানো শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাত। এতে করে উভয় পক্ষ একে অন্যের ব্যাপারে ভালমন্দ সব কিছু জানার ও বিবেচনার সুযোগ পায় এবং বিয়ের পরে পারস্পারিক ভালবাসা ও সমঝোতার ভাব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে বিয়ের পয়গাম পাঠানো ছাড়াই যে বিয়ে হয় তার পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা যায় না।

সহীহ্ হাদীস গ্রন্থদ্বয় এর বর্ণনা মোতাবেক, সাহাবী হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রা) এক মহিলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে পরে প্রিয়নবী (স) তাঁকে বলেন—"মুগীরা, ওকে দেখে নাও, কারণ এটা তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসা কায়েম করবে।"

এই হাদীসে দেখার কোন সীমা নির্দ্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামের নির্দ্ধারিত সাধারণ অনুমতির সীমা লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণ অবস্থায় কোন পুরুষকে অপর নারীর হাতের পাঞ্জা ও মুখ ছাড়া অন্য কিছু দেখার অনুমতি দেয়া হয়নি। আর তাও দেয়া হয়েছে শুধু জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদনের সুবিধার্থেই। এতটুকু শিথীলতা ছাড়া জীবন সংগ্রামে টিকে থাকা অস্বাভাবিক কষ্টকর হবার আশংকা থাকতে পারে। অবশ্য, কোন মহিলার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠানোর পর কথাবার্তা অনেকটা পাকাপাকি পর্য্যায়ে এসে পড়লে পরে শুধু নির্দিষ্ট মেয়েটিকে দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে প্রিয়নবী (স) র হাদীস হচ্ছে—

> "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে থাক, তাহলে তখন তাকে দেখে নেয়ায় কোন বিধি-নিষেধ নেই। তবে শর্ত হলো সে, সেই (বিয়ের) উদ্দেশ্যেই দেখবে। তা সেই মহিলাটি (এ ব্যাপারে কিছু) জানুক বা না জানুক।" (আহমদ)

অন্য এক প্রসঙ্গে প্রিয়নবী (স) বলেন—

"যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিয়ের পয়গাম পাঠায় এবং তাকে দেখতে চায় তাহলে দেখতে পারে।" (হাদীস)

উল্লেখযোগ্য যে এখানেও ইসলাম মেয়ে দেখার সেই স্বাধীনতা দেয়নি যা বর্তমান যুগে প্রচলিত দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, বিয়ের প্রস্তাবকারী ব্যক্তি মেয়েটিকে সেই পোষাকে দেখতে পারে—যা পরে মেয়েরা পিতা বা ভাইদের সামনে উপস্থিত হয়। এছাড়া বিয়ের আগে পাত্রীর মন-মেযাজ বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবগতি অর্জনের জন্য কোন মহররম-এর (পিতা, আপন ভাই, মামা, চাচা ইত্যাদি) উপস্থিতিতে কোথাও ভ্রমণ করা বা দেখা সাক্ষাৎ করার অনুমতি থাকতে পারে।

উপরে বর্ণিত হাদীসের আলোকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, প্রস্তাবিত মেয়েকে যখন দেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে তখন তার ব্যবহার মনমেযাজ ও চরিত্র সম্পর্কে অবগতি অর্জন করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কারণ, আসল জানার বিষয় হচ্ছে তাই। হাদীসের বাণীর সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়—এ ভাবেই উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ও একাত্মতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

এই বিশেষ অবস্থায় পাত্রীকে দেখার অনুমতি দানের মধ্যে ইসলামী শরীয়তের (আইন বিধি) বাস্তব উদারতা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়। এটা নিঃসন্দেহে এক অনন্য উদারতা। এতে করে যে কোন যুগের মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের বেলায় নিজের বিচার বুদ্ধির ব্যবহারের সুযোগ পায়।

সাধারণ অবস্থায় যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলা মেশার কোন সুযোগ নেই, সেখানে বিয়ের বিশেষ অবস্থায় পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাতের অনুমতি দান করাটা অত্যন্ত তাৎপর্যময়। ইসলাম যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যমপন্থী জীবনাদর্শ এ থেকেও তা স্পষ্ট হয়ে যায়। ইসলামে কোন চরম পন্থার অবকাশ নেই, আর অবাস্তব বা অস্বাভাবিকতার কোন স্থানও ইসলামে নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা আজকের যুগের মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হই। আজ মুসলমানরা প্রিয়নবী (স)র সুন্নাতের কোন পরোয়া না করে যাচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে এবং সবক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির প্রদর্শনী করছে। অনেক ক্ষেত্রে সুন্নাতের নামে বা সুন্নাতের আড়ালে সুন্নাতবিরোধী তৎপরতা চালাতেও তাদের ভয় হয় না।

একদিকে এক শ্রেণীর মুসলমানকে দেখি, তারা কোন অবস্থাতেই বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখার বিন্দুমাত্র সুযোগ দেয় না, আর অন্যদিকে এক শ্রেণীর মুসলমান বিয়ের আগে পাত্রকে পাত্রী দেখানোর বাহানায় যাচ্ছেতা করার এবং যত্রতত্র অবাধে ঘুরে বেড়ানোর খোলা অনুমতি দিয়ে রেখেছে বা শুনলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। আসলে এই উভয় চরম পন্থাই ইসলাম বিরোধী।

কোন জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই বিষয়টির আগাগোড়া ভাল করে চিন্তা করে দেখলে পরে বলতে বাধ্য হবে যে এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষাটিই যথার্থ উপযোগী। পার্থিব আধ্যাত্মিক যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের সিদ্ধান্তই উত্তম। সমগ্র বিশ্বমানবতার স্বার্থে ইসলাম যে জীবন পদ্ধতি দিয়েছে তাই সবচেয়ে সহজ-সুন্দর ও স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, কোন মুসলমান তার অন্য মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবিত পাত্রীর কাছে নিজের প্রস্তাব পাঠাবে না।

কোন মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, সে জেনে বুঝে নিজের বিয়ের প্রস্তাব সেই মেয়েকে পাঠায় যার কাছে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাব ইতিমধ্যেই পাঠানো হয়েছে। কারণ, এতে করে দুই মুসলমানের মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বা শত্রুতামূলক উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এটা হীন মনোবৃত্তির পরিচয়ও বহন করে।

এ জন্যে প্রিয়নবী (স) এ ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধ করে বলেছেন—

"কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব পাঠাবে

না যতক্ষণ না সে (আগের প্রস্তাবক), তার প্রস্তাব তুলে নেয় অথবা তাকে (দ্বিতীয়জনকে) অনুমতিদান করে ।"

(হাদীস)

উপরের হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে মালেকী মতাবলম্বী আলেমদের অভিমত হচ্ছে—"যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মহিলার সাথে বিয়ে করে নেয় তাহলে সেই বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে ।" ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অভিমতটি যথার্থ । কারণ তাতে ইসলামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধপূর্ণ ।

——

মোহর

মোহরের পরিমাণ

ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি বিধি বিধানে স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধে এবং নমনীয়তাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় কড়াকড়ি এবং জটিলতা ইসলামী নীতির পরিপন্থী।

বিয়ের বিধান ইসলামী শরীয়তেরই একটি অংশ। বরং বিয়ে এমন এক 'ফরয' যা আল্লার পক্ষ থেকে গোটা জাতির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এজন্যে বিয়ের ব্যাপারে কোন রকমের অর্থনৈতিক বা বৈষয়িক বাধা বিপত্তি সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী কাজ। কেউ কোন উপায়ে বিয়ের ব্যাপারে নেতিবাচক বা বিপত্তি সৃষ্টিকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনা। কেউ কোন সমস্যার সৃষ্টিও করবেনা। কেননা আল্লাহ বলেছেন—

> "আল্লাহ্ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্যে কোন রকমের জটিলতা রাখেন নি।" (আলকোরান)

এজন্যেই আল্লাহ্ ইসলামের সব কর্মে ভারসাম্যপূর্ণতাকে পছন্দ করেছেন। বলাবাহুল্য বিয়ে সংক্রান্ত সব ব্যাপারেই তা মোহর বা অন্য কোন কিছু— ইসলামের সেই নীতিকেই বুনিয়াদ মেনে চলতে হবে। বিয়ের সম্পর্কে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "সবচেয়ে বরকত পূর্ণ বিয়ে সেটাই যাতে কম থেকে কম ব্যয় করা হয়েছে।"

অন্য এক স্থানে প্রিয়নবী (স) বলেছেন--

> "সবচেয়ে উত্তম মোহর সেটাই যা আদায়কারীর জন্যে সহজ হয়।"

এমনিতে ইসলাম মোহরের নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেনি। অবশ্য হাদীসে সেই মোহরকেই উত্তম বলা হয়েছে যা আদায় করতে কোন অসুবিধে না হয়। প্রিয়নবী (স)-র হাদীসটি হচ্ছে

"যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার মোহরের পরিবর্তে এক মুঠো গম দেয় তাহলে তা তার জন্যে বৈধ।

হযরত উমর (রা) বলেছেন "বিয়েশাদীতে মোহরের পরিমাণ অনেক বেশী রেখো না। কেননা (মোহর) বেশী ধার্য করার যদি কোন রকমের পার্থিব বা পরকালীন কল্যাণ থাকতো তাহলে আল্লাহর রাসূল তা অবশ্যই করতেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, নাসায়ী, তিরমিযী)

তবে মোহর কম করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করবে। কারণ, একটি পরিমাণ যেখানে একজনের জন্যে সহজ মনে হবে তা অন্য আরেকজনের জন্যে মুশকিলও হতে পারে। কারণ প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকম নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রিয়নবী (স) যখন উম্মুল মোমেনিন হযরত উম্মে হাবীবার (রা) সাথে বিয়ে করেন তখন নাজ্জাশী প্রিয়নবী (স)-র মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য নিজের পক্ষ থেকে চার হাজার দিরহাম বা দুশ দীনার মোহর হিসেবে দেন এবং প্রিয়নবী (স) তখন এই পরিমাণ টাকাকে বেশী মনে করেন না, কারণ বাদশাহদের মান অনুযায়ী এটা কম ছিল। কিন্তু যখন এক দরিদ্র ব্যক্তি এসে প্রিয়নবী (স)-কে বললো যে, "আমি এক মহিলার সাথে ১৬০ দিরহাম মোহরে বিয়ে করেছি" তখন প্রিয়নবী (স) এই পরিমাণকে অনেক বেশী মনে করেন এবং তাকে বললেন—"এখন মনে হচ্ছে যে তুমি পাহাড় থেকে রূপা খোদাই কর।"

দেনমোহর আদায়ের ব্যাপারে ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নবী (স) এক ব্যক্তিকে বললেন—"মোহর আদায় কর—তা লোহার একটি আংটিই হোক না কেন।" কিন্তু যখন লোকটি ফিরে এসে প্রিয়নবী (স)কে বললো—যে তার কাছে লোহার আংটি নেই। এরপর প্রিয়নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন "কোরানের কিছু সূরা কি তোমার স্মরণ আছে? লোকটি তার মুখস্থ সূরাসমূহের নাম নিয়ে বললো যে অমুক অমুক সূরা তার মুখস্থ রয়েছে।" এরপর প্রিয়নবী (স)বললেন—'আমরা তোমার বিয়ে এই শর্তে করিয়ে দিচ্ছি যে—তুমি তাকে (স্ত্রী) ওসব সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে—যা তোমার মুখস্থ রয়েছে।' অন্য হাদীস মোতাবেক প্রিয়নবী(স) বলেন—'এই

শর্তে বিয়ে করিয়েছি যে তুমি তাকে কোরানের কোন সূরা মুখস্থ করিয়ে দেবে।"

এ ধরনের আর একটি ঘটনা হযরত আবু তালহা (রা) এবং হযরত উম্মে সলিমের (রা) ও রয়েছে; আবু নঈম তাঁর 'আল হুলিয়াত' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন ঘটনাটি হচ্ছে আবু তালহা উম্মে সলিমের কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আবু তালহা তখনো মুসলমান হননি, তাই হযরত উম্মে সলিম (রা) তাঁকে জবাবে বলেন যে, এই প্রস্তাব আসলে প্রত্যাখ্যান করার মতো নয় কিন্তু আপনি তো কাফের এবং আমি মুসলমান। অতএব আপনার সাথে বিয়ে করা আমার জন্যে বৈধ নয়। তালহা একথা শুনে বললেন ঃ

—এ আবার কেমন বিপদ মাথায় তুলে নিয়েছ ?

উম্মে সলিম তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন--

—আমার আবার কি বিপদ··· ?

তালহা বললেন--

—তুমি কি পরিমাণ সোনা-রুপা চাও ?

উম্মে সলিম বললেন

—সোনা-রুপার দরকার নেই। আসল সমস্যা হচ্ছে, আপনি এমন বস্তুর পূজা করেন যে শুনতে পায় না এবং দেখতেও পায় না। আর তা আপনার কোন লাভক্ষতিও করতে পারে না। সেই কাঠের পূজা করতে কি আপনার লজ্জা হয় না যা আপনার হাবসী গোলাম টেনে হিঁচড়ে আপনার কাছে আনে ? যাইহোক এই কারণে আমি আপনার সাথে বিয়ে করতে পারি না। তবে হ্যাঁ, আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে তাই হবে আমাদের দেন-মোহর। এছাড়া আর কিছু চাইনে।"

আবু তালহা উম্মে সলিমকে জিজ্ঞেস করলেন

—রমিসা। আমি কিভাবে ইসলাম গ্রহণ করবো ?

উম্মে সলিম বললেন—

—এর জন্যে আপনি প্রিয় নবী (স)-র কাছে যান।

সুতরাং আবু তালহা প্রিয় নবী (স)-র দরবারে রওয়ানা হলেন। প্রিয় নবী (স) তাকে আসতে দেখে নিজের পাশে বসা সাথীদের বললেন—

"—আবু তালহা আসছে। আমি তার উভয় চক্ষুর মাঝখানে ঈমানের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।"

আবু তালহা প্রিয়নবী (স)-র কাছে ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয়নবী (স)-কে ওসব কথা বলে দিলেন যা তাঁদের উভয়ের মধ্যে হয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (স) তাঁদের বিয়ে সেই শর্তেই করিয়ে দেন।"

এই হাদীসের বর্ণনা এতই স্পষ্ট যে এরপর আর কিছু ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না।

মোহর—নারীর অধিকার

মোহর নারীর সেই অধিকার যা ব্যবহার করার পূর্ণ অধিকার ইসলাম শুধু নারীকেই দিয়েছে। এ সম্পর্কে কোরানে বলা হচ্ছে

> "এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্ট চিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর।" (নিসা ঃ ৪)

ইমাম কারতুবী এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন "মোহর আসলে আল্লার পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্যে এক উপহার।"

ইসলাম মোহরকে শুধু স্ত্রীর অধিকার বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। নয়তো ইসলাম পূর্বকালে নারীর এই অধিকার তার পৃষ্ঠপোষকরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিতো আর নারীর ভাগ্যে একটি কাণাকড়িও জুটতো না। ইসলাম নারীকে অন্যান্য সব অধিকার দানের সাথে সাথে তার মোহরের উপরও পূর্ণ অধিকার দান করে। মোহরের উপর পিতা-ভাই-স্বামী বা অন্য কারো কোন অধিকার নেই। মোহরের টাকা ব্যবহার বা ব্যয় করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন। অন্য কোন ব্যক্তি যদি মোহরের টাকা ব্যয় করে বা টালবাহানা করে মোহরের টাকা আত্মসাৎ করে তাহলে সে বিশ্বাসঘাতকতার পাপে পাপী হবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্যে নারী মুক্তির এই উন্নতির যুগেও নারীকে আজ পর্যন্ত এই অধিকার দেয়া হয়নি। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সমাজের নারীদের মতো আজো ইউরোপ আমেরিকার মহিলারা নিছক পুরুষদের

খেলতামাসা ও ভোগের বস্তুতে পরিণত রয়েছে। ওসব দেশে এখনো এই নিষ্ঠুর কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যে মেয়ে বিয়ের সময় যৌতুকের নামে পিতৃগৃহ থেকে বিপুল অর্থ-সম্পদ ও সাজসরঞ্জাম স্বামীর ঘরে নিয়ে যায় এবং তার সব কিছু স্বামীর অধিকারে চলে যায়। অবস্থা দেখে মনে হয় নারীই যেন উল্টো পুরুষকে মোহর আদায় করছে। এই কুপ্রথা এমন প্রচলিত যে—এঁছাড়া আজ কেউ বিয়ে শাদীর কথা ভাবতেই পারে না।

যৌতুক

আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করে দেখেছি যে মোহর সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রীর মোহর আদায় করা শরীয়তের আইন মোতাবেক প্রতিটি স্বামীর জন্যে ফরয। এর বিনিময়ে স্বামী কোন অর্থেই যৌতুকের দাবী করতে পারে না। যৌতুক দাবী করার কোন অধিকারই স্বামীর নেই, অবশ্য স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে কোন জিনিষ আনে বা দেয়— তাহলে তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু স্বামী বা স্বামী পক্ষের কেউ যৌতুকের উপর কোন অধিকার দাবী করতে পারবে না। মোহরের সাথে যৌতুকের কোন যথার্থ নেই। যেমন আল্লাহ বলেন—

> "এবং নারীদের মোহর সন্তুষ্টচিত্তে (ফরয মনে করে) আদায় কর, অবশ্য সে যদি নিজের খুশীমত মোহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয় তাহলে তোমরা তা আনন্দে খেতে পার।"
>
> (নিসা ঃ ৪)

আজকাল ছেলের পক্ষ থেকে কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য জিনিষের যে দাবী করা হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম—অবৈধ।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ছেলের পক্ষ থেকে যৌতুক হিসেবে এত বিপুল মূল্যের জিনিষপত্র দাবী করা হয় যে তা মেয়ে পক্ষের সাধ্যের বাইরে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে মেয়েপক্ষ সুদে-ঋণ করে হলেও ছেলের দাবী মেটাতে বাধ্য হয়। এটা সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরোধী কাজ। মেয়েপক্ষের

কাছে যৌতুক দাবী করাটা বিরাট যুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যৌতুক নামক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সকল মুসলমানকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আসলে যৌতুক পাওয়া ধনসম্পদ ও আসবাব পত্রে কোন বরকত নেই। তা যেভাবে আসে সেভাবে চলে যায়, এমন কি তা ক্ষতিকর বলেও প্রমাণিত হয়। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যৌতুকের ভিত্তিতে যে বিয়ে হয় তার পরিণাম কখনো শুভ হয় না, স্ত্রীর কাছে যৌতুক গ্রহণকারী স্বামী সব সময় হীন হয়ে থাকে এবং উভয়ের মধ্যে কখনো আন্তরিক ভাল-বাসা গড়ে উঠতে পারেনা।

বলা বাহুল্য আজকের যুগে প্রচলিত যৌতুক সম্পূর্ণরূপে ইসলাম বিরুধী একটি হারাম কাজ এবং এটা হচ্ছে জঘন্য অপচয়। এছাড়া যৌতুকের মাধ্যমে প্রদর্শনী ও অহংকারের অনুভূতি সক্রিয় থাকে। যৌতুক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অপচয়ের নিন্দা করে আল্লাহর কোরানে বলা হয়েছে ঃ

> "অপচয়কারী শয়তানের ভাই এবং শয়তান নিজ প্রতিপালকের কাছে অকৃতজ্ঞ।"

বস্তুত মেয়ে পক্ষ নিজেদের খুশীমতো সহজ ভাবে এবং ছেলে পক্ষের কোন দাবী দাওয়া যা দেয়, এবং যাতে কোন অপচয় প্রদর্শনী বা অহংকারের ভাব থাকেনা—তাই হচ্ছে উত্তম যৌতুক। এতে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সন্তুষ্টি পাওয়া যায় এবং এতে অপচয় এবং লোক দেখানো প্রদর্শনীর কোন আশংকা থাকে না।

—

বিয়ের উৎসব

ওলীমা

বিয়ের দিন নিঃসন্দেহে আনন্দের দিন। এদিন পাড়া প্রতিবেশী এবং আত্মীয়স্বজন সবাই একত্রিত হয়ে থাকে। এই আনন্দের মুহূর্তে পাত্রপক্ষকে তার ক্ষমতা মোতাবেক লোকদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করা উচিত। প্রিয়নবী (স) যখন তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা)-কে হযরত আলীর-(রা) সাথে বিয়ে দেন তখন প্রিয়নবী (স) বলেন—

"বিয়েতে প্রীতিভোজ (ওলীমা) অবশ্য হওয়া চাই।"

প্রিয়নবী (স)-র এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন ফকীহ এই যুক্তি পেশ করেন যে বিয়েতে "প্রীতিভোজ" ফরয, অবশ্য অন্যান্য ফকিহদের মতে বিয়ের প্রীতিভোজ শুধু মুস্তাহাব।

এভাবে প্রিয়নবী (স) যখন হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর সাথে বিয়ে করেন তখন একটি ছাগল যবেহ করে প্রীতিভোজ দেন এবং যখন হযরত আসিয়ার (রা) বিয়ে হয় তখন প্রিয়নবী (স) খেজুর পনীর ও ঘী সহকারে প্রীতিভোজ দেন। প্রিয়নবী(স) তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের বিয়ে উপলক্ষে গমের রুটি সহকারে প্রীতিভোজের ব্যবস্থা করেন। প্রিয়নবী নিজে হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা)কে বলেছেন—

"ওলীমার (প্রীতিভোজে) দাওআত করো—তা একটি ছাগলেরই হোকনা কেন।"

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা প্রীতিভোজের আয়োজনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আর্থিক অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে যেভাবে যতটুকু সম্ভব ততটুকু লোকদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করো। বিখ্যাত ফিকাহ গ্রন্থ ''নায়লুল আওতারে'' উল্লেখ

রয়েছে ওলীমার সবচেয়ে কম সীমা হচ্ছে একটি ছাগল। যদি এ কথার প্রমাণ মওজুদ না থাকতো যে প্রিয়নবী(স) একটি ছাগলের কমেও ওলীমার আয়োজন করেছেন—তাহলে কমপক্ষে একটি ছাগলের ওলীমা প্রত্যেকের জন্যে করজ হয়ে যেত। "এরপর বিচারপতি কাযী আয়ায-এর এই বক্তব্য নকল করা হয়েছে যে, ফকীহদের এব্যাপারে ঐকমত রয়েছে যে, বেশী থেকে বেশী ওলীমার আয়োজনের কোন সীমা নির্ধারিত নেই আর ওলীমার কম থেকে কম সীমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমতার উপর দেয়া হয়েছে। (নায়লুল আওতার ঃ ১৭৬)

ওলীমা বা প্রীতিভোজে নিজের পরিচিত বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় ও প্রতিবেশী ধনী দরিদ্র সবাইকে আমন্ত্রিত করা উচিৎ।

প্রীতিভোজে কেবল ধনীদের আমন্ত্রণ জানানো এবং দরিদ্রদের অবহেলা করা অত্যন্ত আপত্তিকর কথা এবং যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের নীচ ও হীনতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। যারা তাদের প্রীতিভোজ বা অন্য কোন সাধারণ যিয়াফতে দরিদ্রদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের দাওআত করে তারা যেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি কিনে নিলো, কারণ প্রিয়নবী (স) বলেছেন ঃ

> "অত্যন্ত মন্দ ওলীমার ভোজ হচ্ছে সেটা যাতে শুধু ধনীদের আমন্ত্রিত করা হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেয়া হয়।"
>
> (বোখারী ও মুসলিম)

আমন্ত্রণ গ্রহণ করা রাসূলের সুন্নাত। প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "যখন তোমাদের কাউকে ওলীমা ভোজের আমন্ত্রণ জানানো হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিৎ।"

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "যদি কোন ব্যক্তি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে তাহলে সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করে।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (স) একবার এক ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাল। লোকটি অক্ষমতা প্রকাশ করলো কিন্তু তিনি তার অক্ষমতা গ্রহণ করতে স্পষ্ট অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন ঃ

> "কিসের অক্ষমতা ? চল.....উঠ..... ।।

এর পর কেউ যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রীতিভোজে পৌছোয় তখন তাকে ধৈর্য ও শোকরের সাথে খাদ্য গ্রহণ করা উচিৎ, আর যদি কেউ রোযা রেখে থাকে তাহলে তা আমন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া উচিৎ এবং তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিৎ। হাদীসে আছে—

> "তোমাদের মধ্যে কাউকে যখন দাওয়াত করা হয় তখন তা গ্রহণ করা উচিৎ। যদি সে রোযা অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে অক্ষমতা প্রকাশ করা উচিত তার জন্যে শুভ প্রার্থনা করা উচিৎ কিন্তু যদি রোযা না করে থাকে তাহলে সবর ও শোকরের সাথে ভোজ-গ্রহণ করবে।"
>
> (আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ)

কিন্তু ভোজসভায় যদি এমন কোন দ্রব্য দেখতে পাওয়া যায় যা খাওয়া আল্লাহর নিষিদ্ধ তাহলে নীরবে ফিরে চলে আসা উচিৎ। ইমান ইবনে হাসান বলেন—যদি সেখানে রেশমী চাদর বিছানো থাকে, গৃহ যদি হারাম আয়ের তৈরী হয়, আর খাদ্য হয় ছিনিয়ে নেয়া দ্রব্যের, আর যদি থাকে মদের আয়োজন তাহলে সেখান থেকে ফিরে চলে আসা উচিৎ।

হযরত আলী (রা) বলেছেন "তিনি প্রিয়নবী (স)কে ভোজে আমন্ত্রিত করেন তিনি সেখান উপস্থিত হন। প্রিয়নবী (স) তাঁর গৃহে ছবি লটকানো দেখে ফিরে চলে আসেন। (ইবনে মাজা)

প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস রাখে, তাকে এমন ভোজসভায় কখনও বসতে নেই, যেখানে মদ্যপান চলে।

বিয়ের আনন্দ

বিয়ে শাদীতে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানো যেতে পারে। একবার হযরত আয়েশা (রা) এক আনসারী সাহাবী (স)-র সাথে তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ে দিচ্ছিলেন। তখন প্রিয়নবী বললেন :

"আয়েশা। তোমাদের কাছে কি কোন উৎসবের সরঞ্জাম নেই ? আনসাররা তো উৎসব পছন্দ করে।

গীত ও গানের সাথে দফ বাজানোর ব্যাপারে প্রিয়নবী (স)-র আরেকটি বাণীও লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন-

"বিয়েশাদী উপলক্ষে গীত ও গানের সাথে দফ্ বাজানোতে কোন ক্ষতি নেই।

তবে প্রিয়নবী (স) এমন বিয়েশাদী পছন্দ করতেন না যা নীরবে হয়ে যায় এর জন্যে যেন খুব ভাল করে ঘোষণা করা হয়। মুসনাদে আহমদে উল্লেখ রয়েছে প্রিয়নবী (স) চুপ্‌চাপ্ নীরব বিয়েকে পছন্দ করতেন না, হস্তক্ষণ না তাতে দফ্ না বাজানো হয় এবং এই গান না গাওয়া হয়ে যে-

"...এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা
তোমাদের মোরা বলি মারহাবা...

এভাবে প্রিয়নবী (স) বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ বাজানোকে সুন্নাত বলে অভিহিত করেছেন এবং এমন বিয়েকে অপছন্দ করেছেন যাতে আনন্দের কোন ব্যবস্থা নেই এদিকে লক্ষ্য রেখে আজকালের যুগেও বিয়ে শাদীতে এমন গীত গান যাতে অশ্লীলতা নেই, তা গাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে বাজারী ধরনের বাজে গান গীত গাওয়ার কোন অনুমতি নেই। নোংরা অর্থপূর্ণ, বা এমন গান যা পাশবিক প্রবৃত্তিকে উস্কিয়ে দেয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গানের কথা যদি রুচিপূর্ণ ও শালীন হয় তাহলে তাতে কোন নিষেধ নেই। বিয়ের গান যে কেউ গাইতে পারে। পুরুষ-মহিলা-বালক-বালিকা, যে কেউ বিয়ের গানে শরীক হতে পারে। এর প্রমান হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা) এর সেই ঘটনা—যখন তিনি তাঁর এক বান্ধবীর বিয়ের পরে তাঁকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠান, তখন প্রিয়নবী (স) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন-

—: আয়েশা ! তোমরা কি মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছ ?"
তিনি জবাব দিলেন
—: হ্যাঁ, হে আল্লার রাসূল=
প্রিয়নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন—
—: তোমরা ওর সাথে গায়িকাদের পাঠাও নি ?'
তিনি বললেন
—: না'
প্রিয়নবী (স) বললেন—
—: আরে.........আনসাররা তো গীতের পাগল। তোমরা কোন গায়িকা মেয়ে পাঠালে না কেন ?"
হযরত আয়েশা (রা) জিজ্ঞেস করলেন—
—: কিন্তু, হে আল্লার রাসূল ! তারা কি গাইবে ?
প্রিয়নবী (স) বললেন—
—: গান এ ধরনের হবে—
("এসেছি মোরা তোমাদের কাছে
এসেছি মোরা তোমাদের পাশে
তাহলে, মোদের বল মারহাবা
তোমাদের মোরা বলি মারহাবা।
যদি এই গম্-গন্দমী—
না হতো হেথা—
কভু দেখতেনা মোদের
তোমাদের মধ্যে; তোমাদের পাশে।")

সাহাবা কেরাম ও প্রিয়নবী(স)র এই রেওয়ায়েত থেকে উপকৃত হয়েছেন। তারা বিয়ে অনুষ্ঠানের আনন্দে নিজেরাই অংশগ্রহণ করতেন এটাকে তাঁরা আপত্তিকর কিছু মনে করতেন না। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আমের বিন সা'আদ (রা) বলেন—"আমি এক বিয়েতে গিয়ে দেখি যে কারজা বিন কা'আব (স) ও আবু

মাসুদ আনসারী (রা) ওখানে আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছেন এবং কয়েকটি বালিকা সেখানে দফ বাজিয়ে গান গাচ্ছে। আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করলাম 'ওগো রাসূলের সাহাবীরা; আপনাদের সামনে এসব কি হচ্ছে?' তাঁরা বললেন— 'বসতে যদি চাও তাহলে বস আর যেতে চাইলে যাও। কারণ প্রিয়নবী (স) নিজেও এধরণের মাহফিলের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করেননি। আনন্দের মুহূর্তে এ ধরণের নির্দোষ খেলাধুলা দেখেছেন এবং এসবের আয়োজন করার পরামর্শও দিয়েছেন। এর অর্থ এই যে, ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনকে সত্যিকার আনন্দ উল্লাস থেকে বঞ্চিত রাখেনা বরং পরিচ্ছন্ন আনন্দ উল্লাসের সুযোগ দান করেছে, যেন তাদের জীবন শুষ্ক ও নিরানন্দ না হয়ে থাকে। ইসলামে স্থবিরতা ও বিরক্তির অবকাশ নেই। মানুষ তার স্বভাবের তাগিদে পরিচ্ছন্ন ও শালিনতার মধ্যে থেকে নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। ইসলাম রুচীবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দের সাথে সাথে ইবাদাতকেও সমন্বিত করে দিয়েছে। এভাবে আনন্দ ও ইবাদত পরস্পর একই সূত্রে গেঁথে গেছে কিন্তু খেলাধুলা ও কৃষ্টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাহানায় বা এসব স্বাভাবিক আনন্দ উল্লাসের আড়ালে কোন রকমের নোংরামী বা অশ্লীল কার্যকলাপের বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। সুতরাং কেউ যেন কোন রকম অবৈধ তৎপরতা চালানোর অপচেষ্টা না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বরং এর মাধ্যমে তারা চরিত্র গঠন, শ্লীলতা ও আত্মমর্যাদা সংরক্ষণের প্রয়াস পাবে।

স্ত্রীর অধিকার

ভরণপোষণ

স্ত্রী ধনী হোক বা দরিদ্র--ইসলাম তার ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত করেছে। অবশ্য স্ত্রী যদি ধনী হয় এবং আনন্দচিত্তে স্বামীকে কিছু আর্থিক সাহায্য দেয়া পছন্দ করে তাহলে কোন বাধা নেই। কিন্তু স্ত্রীর খাওয়া, পরা, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব স্বামী তার আর্থিক অবস্থা মোতাবেক পালন করবে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর (স) স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে--

"ওদের খাওয়া পরার ব্যাবস্থা করা স্বামীদেরই দায়িত্ব।"

এই হাদিসে যদিও বাসস্থান বিছানাপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের নাম উল্লেখ নেয়, কিন্তু ভরণপোষণ করার সাথে ওসব জিনিষ স্বাভাবিক ভাবেই শামিল থাকে। এজন্যে ওসব কিছুর পৃথক পৃথক নাম নেয়ার দরকার হয়না। কিন্তু কোরান শরীফে বাসস্থানের উল্লেখও রয়েছে। আল্লাহ বলেন---

> "ওদের (স্ত্রীদের) সেসব জায়গায় রাখ যেখানে তোমরা থাক, যেমন জায়গাই তোমাদের থাকে এবং বিরক্ত করার জন্যে ওদেরকে কষ্ট দিওনা। (তালাক---৭)

ইসলাম স্ত্রীদের বাসস্থানের সমস্যা যেখানে সমাধান করে দিয়েছে সেখানে অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থাও যে স্বামীর দায়িত্বে ন্যস্ত করেছে তা বলাই বাহুল্য। স্বামীরা স্ত্রীদের বসবাসের জন্যে সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীরও ব্যবস্থা করবে।

এখন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, স্ত্রীদের ভরণ পোষণের মান কি হবে? এর জবাবে ইসলাম স্বামীর আর্থিক মানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বামী যদি ধনী হয় তাহলে স্বচ্ছলতার সাথে, আর যদি দরিদ্র হয় তাহলে যেমন জোটে তেমন ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবে। এ ব্যাপারে কোরাণে বলা হচ্ছে—

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা মোতাবেক ভরণপোষণ দেবে আর যাদেরকে কর্ম জীবিকা দেয়া হয়েছে তারা সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তা থেকে বেশী তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অসম্ভব কিছু নয় যে আল্লাহ দারিদ্রের পর সমৃদ্ধিও দান করবেন।" (তালাক—৭)

প্রিয়নবী (স) ও একই নির্দেশ দিচ্ছেন—

"প্রচলন মোতাবেক তোমাদের স্ত্রীদের খাবার ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর ফরজ (অবশ্য কর্তব্য)।

যেমন, কোন ব্যক্তি যদি ধনী হয় যে নিজ স্ত্রীকে রেশমী পোষাক পরাতে সক্ষম তাহলে স্ত্রীকে তার রেশমী বস্ত্র দেয়াই উচিৎ। ইমাম জহুরীকে মহিলাদের রেশমী বস্ত্র পরিধান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—"আমাকে হযরত আনাস (রা) বলেছেন তিনি রাসূলুল্লাহর (স) মেয়েকে রেশমী চাদর ব্যবহার করতে দেখেছেন।"

হাফেয ইবনে হাজার তাঁর 'আল এসাবা' গ্রন্থে হাসীসটিকে সঠিক বলে বর্ণনা করেছেন।

পারস্পারিক সম্প্রীতি

আল্লাহ বলেছেন—

"এদের (স্ত্রীদের) সাথে উত্তমপন্থায় জীবন যাপন কর, যদি তারা তোমাদের অপছন্দ হয়, তাহলে হতে পারে একটি বিষয় তোমাদের অপছন্দ হবে, কিন্তু আল্লাহ তাতে কোন কল্যাণ রেখে দিয়ে থাকবেন।" (তালাক—৬)

আল্লাহ আরো বলেছেন—

"তাদের (স্ত্রীদের) বিরক্ত করার জন্যে তাদের কষ্ট দিওনা। (তালাক—৭)

এসব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানদের এটা জানিয়ে দিচ্ছেন যে স্ত্রীদের দুর্ব্যবহারে বিরক্ত করা এবং বিনা কারণে কষ্ট দেয়া যাবে না। এজন্যে কেউ যদি নিজেকে যথার্থ মুসলমান মনে করে সে যেন কোন কথায় বা কাজে আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন না করে। কেউ যদি আল্লার স্পষ্ট আদেশের অমান্য করে তাহলে সে সীমা লংঘণ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযীতেও একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। প্রিয়নবী (স) বলেছেন—"তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে নিজের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।"

অন্য এক হাদীস হচ্ছে--

> "তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম সেই ব্যক্তি যে তার পরিবার পরিজনের পক্ষে উত্তম এবং আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নিজের পরিবার পরিজনের পক্ষে উত্তম।"

ইসলামের এই স্পষ্ট নির্দেশ ও উপদেশাবলি থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে কোন কোন অজ্ঞ অভদ্র লোক নারীদের উপর জোর যুলুম করে নিজেদের পৌরুষত্ব দেখানোর নিন্দনীয় প্রয়াস পায়। এ ধরনের নোংরা লোকরা নারীদের সাথে স্নেহ-দয়া প্রদর্শন ও নম্র ব্যবহারকে তাদের পৌরুষত্বের বিরোধী বলে মনে করে। এটা সত্যিই ঘৃন্য মনোবৃত্তি। এতে করে একদিকে তাদের চিন্তার অসারতা প্রমানিত হয় এবং অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি ব্যাহত হয়। বস্তুতঃ নারীদের সাথে নম্র ও ভদ্র ব্যবহার করা এবং তাদের ছোটখাটো ভুলত্রুটির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার মধ্যেই রয়েছে পৌরুষসুলভ সৌন্দর্য। নারীদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা উচিৎ। যারা নারীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে তারা তাদের জ্ঞানবুদ্ধির গভীরতা এবং জীবনযাপনে আসল পদ্ধতির সাথে পরিচয়ের প্রমাণ পেশ করে। নারীদেরকে কথায় কথায় শাসানো, ভয় দেখানো, বকাঝকা করা, মারপিট করা চরম অন্যায় এবং ইসলামী শিক্ষার বিরোধী। যদি তারা ভুল করে, দোষ করে তাহলে সুন্দর ভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়ে ভুল-দোষ শোধরানোর সুযোগ দিতে হবে। নয়তো তাদের মন ভেঙে যাবে এবং গোটা পারিবারিক পরিবেশ তিক্ততায় ভরে যাবে।

সুস্থ ও সুন্দর দাম্পত্য জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের অন্যতম দাবী হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি অযথা সন্দেহ পোষণ করা এবং তার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কৌতূহলী হওয়া উচিৎ নয়। কোন কোন স্বামীকে দেখা যায় স্ত্রীদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত সন্দেহ প্রবন ও অপ্রয়োজনীয় কৌতূহল প্রকাশ করে থাকে। এ ধরণের দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন স্বামীরা স্ত্রীদের গতিবিধিকে সর্বক্ষণ ভুল-দৃষ্টিতে খর্বেক্ষণ করে এবং তাদের কথাবার্তা থেকে ভুল অর্থ বের করে। এসব নেতিবাচক দিক যে কতো বেশী ক্ষতিকর তা তারা উপলব্ধি করতেও অক্ষম। এ ধরনের খুঁতখুঁতে মন নিয়ে কোন স্বামীর দাম্পত্য জীবন সুখের হতে পারেনা। তারা সব সময় স্ত্রীদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকে যে তাদের অনুপস্থিতিতে স্ত্রীরা কার কার সাথে মেলামেশা বা কি ধরনের কথাবার্তা বলছে, কি করছে ? আসলে এসব হচ্ছে শয়তানী প্ররোচণা। এ ধরণের ভুল মানসিকতার কারণে কতো যে অঘটন ঘটছে তার হিসেব-নিকেশ নেই। এতে করে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিণাম নেমে আসে। এজন্যে প্রিয়নবী (স) এটাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্ম বলে ঘোষণা করেছেন এবং মুসলমানদেরকে এথেকে বেচে থাকার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী (স) বলেছে--

> "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি রাতের বেলায় স্ত্রীর কাছে এই উদ্দেশ্যে এসো না যে তার পাহারাদারী করছে অথবা তার ভুল ভ্রান্তি খুজে বেড়াচ্ছে। (মুসলিম)

এর অর্থ এই যে স্বামী যেন তার স্ত্রীর কাছে হঠাৎ করে না আসে কেননা এতে করে তাদের গোপন ভুল গুলো দৃষ্টিগোচর হবার আশংকা থাকে। ইসলাম নারীদের এসব স্বাভাবিক ভুলভ্রান্তির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে বলেছে এবং নারীদের উপর আস্থা ও বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখতে বলেছে। ইমাম ইবনে আবম বলেন 'নারী জাতির প্রতি এতবড় আস্থা ও বিশ্বাস এবং নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারের নির্দেশ শুধু ইসলামই দিয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোথাও ক্ষমা ও উদারতার এই দৃষ্টান্ত আর দেখা যায়না।'

ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্যে নারীদেরকে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশের স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধে দিতে হবে। উম্মুল মোমে-

নীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, "আমি প্রিয়নবীর (স) পাশে বসেও পুতুল খেলা করেছি।'

এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো যে মা আয়েশা (রা) প্রিয়নবীর (স) পাশে বসে পুতুল নিয়ে খেলা করেছেন, কিন্তু প্রিয়নবী (স) তাঁকে তা করতে নিষেধ করেননি। অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন—"আমি আল্লাহর রসুলের ওখানে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার সাথে আমার বান্ধবীরাও থাকতো, তারা আমার সাথে খেলতো। প্রিয়নবী (স) যখন আসতেন তখন ওরা লুকিয়ে পড়তো। তিনি তাদেরকে খুজে বের করে আমার কাছে পাঠাতেন যেন তারা আমার সাথে খেলতে পারে।" (বোখারী ও মুসলিম)

এসব হাদীসের আলোকে যে কোন ব্যক্তি সহজে অনুমান করতে পারেন যে উম্মুল মুমেনীনদের সাথে প্রিয়নবীর (স) দাম্পত্য সম্পর্ক কত সহজ-সুন্দর ও স্বাভাবিক ছিল এবং তাদের আনন্দে রাখার জন্যে তিনি কি সুন্দর সুযোগ দিতেন।

প্রিয়নবীর (স) উম্মত হিসেবে সাধারণভাবে সকল নারী, বিশেষ করে স্ত্রীদের সাথে সহজ স্বাভাবিক ও নম্র ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। আমাদেরকেও আমাদের স্ত্রীদের সাথে মধুর সম্পর্ক কায়েম রাখার জন্যে তাদের রুচী আ নন্দ উল্লাসের চাহিদা মোতাবেক সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করতে হবে।

——

স্বামীর অধিকার

ইসলাম স্বামীদেরকেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দিয়েছে। আমরা নীচে তার উপর আলোকপাত করছি।

স্বামীর আনুগত্য

স্ত্রীরা সব রকমের সৎকর্মে অর্থাৎ ইসলামের নির্দ্ধারিত সীমা মোতাবেক স্বামীর আনুগত্য করবে। স্বামী যদি সহবাসের জন্যে আহবান করে তাহলে স্বামীর আহবানে সাড়া দেবে। এক্ষেত্রে বিনা কারনে যদি অমত প্রকাশ করা হয় তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "স্বামী যখন নিজের স্ত্রীকে সহবাসের জন্যে ডাকে এবং সে আসতে অস্বীকার করে এবং স্বামী দুঃখিত হয়ে রাত কাটায় তাহলে ফিরিশতারা সকাল পর্যন্ত এধরণের নারীর উপর অভিশম্পাৎ করে।" (বোখারী, মুসলিম)

স্বামীর এই অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে নিষেধ করেছে। এ ব্যাপারে প্রিয়নবী (স) বলেন--

> "কোন নারী নিজ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি অর্জন ছাড়া (নফল) রোযা রাখবেনা।" (হাদীস)

স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রী তার নিজের ইজ্জত আবরু এবং স্বামীর ধন সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। অর্থাৎ স্বামী তাকে যেসব জিনিষের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে সে তাতে অবহেলা করবেনা, স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। এটা হচ্ছে স্ত্রীর উপর স্বামীর সেই অধিকার যার ফরয হবার ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই। প্রিয়নবী (স) উত্তম স্ত্রীর গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

"নিজের স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে নিজের এবং তার ধন-সম্পদের ব্যাপারে আন্তরিকতাপূর্ণ থাকবে।

(ইবনে মাজা)

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ থেকে তার অনুমতি ছাড়াই সাদকা দান করার অনুমতি দেয়, কিন্তু স্ত্রীর ধনসম্পদ থেকে স্বামী স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া কোন দান খয়রাত করতে পারবেনা। তবে ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর ধনসম্পদ অপচয় করার অনুমতি দেয় না। স্ত্রী এমন কোন কাজ করবে না যাতে স্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ব্যাপারে প্রিয়নবীর (স) বানী হচ্ছে—

'যদি স্ত্রী স্বামীর ধনসম্পদ থেকে এতটুকু সাদকা দান করে যা স্বামীর জন্যে দুঃখজনক না হয় তাহলে এর জন্য স্ত্রী পুণ্য পাবে এবং স্বামীও ততটা পুণ্য পাবে কেননা এই ধনসম্পদ তারই অর্জিত ছিল। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

স্ত্রীকে তার নিজের ব্যক্তিত্বের হেফাযতের অর্থ হচ্ছে তাই যা প্রিয় নবী (স) বিদায় হজের সময় বলেছেন—

"তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের এখানে এমন কোন ব্যক্তিকে আসতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর।"

(ইবনে মাজা, তিরমিযী)

কেননা, স্বামীকে ভালবাসার দাবী হচ্ছে সেও তাকে ভালবাসবে। আর এমন কাউকে ঘরে আসার অনুমতি দেবে না যার আগমনকে তার স্বামী পছন্দ করে না। তবে ওসব লোক যাদের ঘরে আসার ব্যাপারে তার স্বামীর কোন আপত্তি নেই তাদেরকে প্রয়োজনীয় কাজে ঘরে আসতে দিতে কোন বাধা নেই। যেমন স্বামীর ঘনিষ্ট বন্ধু, মেহমান, ভাই ইত্যাদি যারা নিত্য কাজ কর্মে আসা যাওয়া করে থাকে। এমন লোকদের ঘরে আসতে দেয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে যে, তাদের ঘরে আসার অনুমতি দেয়ার অর্থ পর্দার অন্তরালে থেকে বিভিন্ন দরকারী জিনিষ যেমন বিছানাপত্র, চেয়ার বালিশ ইত্যাদি পাঠানো।

কিন্তু এদের কারো সাথে বসে বসে গল্প করার বা কোথাও আসা যাওয়ার কোন অনুমতি নেই। শরিয়তের আইন মোতাবেক তা নিষিদ্ধ। এমনকি স্বামীর অনুমতিতেও স্ত্রী তাদের সাথে বসে আলাপ-আলোচনা বা কোথাও আসা যাওয়া করতে পারবে না।

দাম্পত্য জীবনে সহযোগিতার ভিত্তি

উপস্থাপনা

> "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে, তিনি তোমাদেরই অস্তিত্ব থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন যেন তোমরা ওদের কাছে শান্তি পেতে পার এবং তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে, এতে অনেক নিদর্শনাবলি রয়েছে ওসব লোকদের জন্যে যারা চিন্তা ভাবনা করে। (রূম—২১)

প্রাচীনকাল থেকে নারীকে আত্মাবিহীন এক অপবিত্র প্রাণী মনে করা হচ্ছিল, পুরুষ নারীকে তার পাশবিক ক্ষুধার শিকারে পরিণত করতো ঠিকই কিন্তু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে তারা ছিল অপ্রস্তুত। পাঁচশো ছিয়াশী সালে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে "নারী পশু নয় বরং মানুষ -তবে পুরুষের সেবার জন্যে বানানো হয়েছে।" এই ছিল তৎকালীন সভ্য সমাজে নারীর মর্যাদা। নারী জাতির প্রতি দুনিয়ার উন্নত মানুষগুলোর এই বিকৃত মনোভাবকে সামনে রেখে যদি আমরা নারী সংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করি তখন আমরা সন্তোষজনক বিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে ইসলাম নারীকে অবনতি ও অবমাননার নিকৃষ্টতম পর্যায় থেকে তুলে এনে উন্নতি ও মর্যাদার উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ এটাকে অন্যতম নিদর্শন বলে ঘোষণা করেছেন এবং যেহেতু নারী ও পুরুষ একই উপাদানে গঠিত তাই উভয়ের গুরুত্ব এবং মর্যাদাও বরাবর। ইসলাম আরো বলে—নারীকে স্বাধীন মানুষ ও স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে—পুরুষের দাসী হিসেবে নয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কোরানে বলেন--

> "এবং তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটা অন্যতম যে তিনি তোমাদের জন্যে স্বয়ং তোমাদেরই মধ্য থেকে স্ত্রীদের বানিয়েছেন।"
> (রূম--২১)

এবং নারীর কাজ থেকে শান্তি অর্জন করতে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এই শান্তি হচ্ছে মানব প্রকৃতিতে সুস্থ সেই অনুভূতি যা সমাজকে সততা ও পবিত্রতার বুনিয়াদ সরবরাহ করে এবং এই শান্তিই স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার দাম্পত্য জীবনকে করে ষোলকলায় সার্থক ও সুন্দর। শান্তি এমন এক আধ্যাত্মিক প্রয়োজন যা একজন পুরুষ কেবল তার স্ত্রী কাছ থেকে পেতে পারে। এই জন্যেই আল্লাহ উভয়ের মধ্যে পরস্পরের জন্যে প্রেমপ্রীতি ও সহানুভূতির অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন।

এসব বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী অন্যান্য ধর্মের কথা মোতাবেক সাপ, প্রেতিনী, ডাইনি বা রাক্ষুসী নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে সমমর্যাদা সম্পন্ন এক স্বাধীন অস্তিত্ব এবং শান্তির প্রতীক। ইসলাম নারীকে এমন এক উৎস মনে করে যা থেকে স্নেহ, দয়া ও সহানুভূতির ফল্গুধারা উৎসারিত হচ্ছে।

মানুষের স্বভাবসুলভ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে বিশেষ আইন বিধি প্রণয়ন করেছে এবং জীবন সংগ্রামের দুষ্কর পথে কিভাবে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা করবে তার সঠিক পন্থা নিরূপণ করেছে। ইসলাম স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে একে অন্যের সহযোগিতায় অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বুনিয়াদ সম্পর্কে আলোচনা করবো—যা প্রত্যেকের জন্যেই জানা জরুরী এবং এরই ভিত্তিতে আপনারা পরিবার পরিজন ও আমাদের লেখকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে সহযোগিতা পাবেন। এ ব্যাপারে বুনিয়াদী নীতি নির্দ্ধারণ করেছে আল কোরান :

> "নারীদের জন্যেও স্পষ্ট পদ্ধতিতে তেমন অধিকারই রয়েছে যেমন পুরুষদের অধিকার ওদের উপর রয়েছে। অবশ্য পুরুষদের ওদের উপরে একটি মান অর্জিত রয়েছে এবং সবার উপরে বর্তমান রয়েছেন সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ।"
>
> (বাকারা-২২৮)

এই কোরানী আয়াত থেকে তিনটি নীতি স্পষ্ট হয়-

(১) **সুবিচার** এই আয়াত থেকে প্রথম যে কথাটি প্রকাশ পায় তা হল—

আল্লার দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী উভয়ের গুরুত্ব সমান। এভাবে স্বামী ও স্ত্রী হচ্ছে জীবন সফরে একে অন্যের সহগামী ও সহকর্মী। এবং এই যাত্রায় উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব সমান সমান। নারী বা পুরুষ কাউকেও পরস্পরের অধিকার হরণ করার কোন ইখতিয়ার দেয়া হয়নি। স্বামী স্ত্রীর অধিকার খর্ব করতে পারবেনা, আর স্বামীর অধিকার খর্ব করার অধিকার স্ত্রীর নেই। উভয়ের মধ্যে যে কারো অধিকার নিয়ে অনধিকার চর্চা করবে সেই সীমালংঘনের দায়ে দায়ী হবে।

(২) সাম্য—দ্বিতীয় যে কথাটি পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ পায় তাহলো উভয়ের অধিকার ও দায়িত্ব বন্টনে তাদের নিজ নিজ স্বভাব ও ক্ষমতার আলোকে পূর্ণ সমতা রক্ষা করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্যযোগ্য যে নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বে সমতা থাকলেও তাদের প্রত্যেকে কর্মক্ষেত্র কিন্তু আলাদা আলাদা। নারী ও পুরুষের কাউকেও এমন কর্মে বাধ্য করা হয়নি যা তাদের রুচী ও স্বভাবের সাথে সংঘাতপূর্ণ হতে পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আববাস (রা) কত সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেন--"আমি নিজের স্ত্রীর কাছে তেমনি সেজেগুজে থাকি যেমন আমি তাকে নিজের সামনে সেজেগুজে থাকতে পছন্দ করি।" এরপর তিনি কোরানের এই আয়াত তেলাওয়াত করে শুনান—

> "নারীদের উপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদের সঠিক অধিকার--এমনকি সাজসজ্জা ও রূপচর্চার স্বাভাবিক অধিকারও দেয়া হয়েছে। পুরুষ ও নারী তাদের পৃথক দৈহিক বৈশিষ্টের কারনে তাদের সাজসজ্জার ধরন ধারনও হবে আলাদা আলাদা উভয়ে উভয়ের রুচী ও বৈশিষ্ট মোতাবেক উত্তম ও রুচীপূর্ণ ভাবে পোষাক পরবে এবং সাজগোজ করবে। এতে করে উভয়ই আন্তরিক আনন্দ পায়।

(৩) পারস্পারিক শলা-পরামর্শ

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরাণে পুরুষ ও নারীদের সব অধিকারের

বিস্তারিত উল্লেখ করেননি—বরং এমন মূলনীতি ঘোষণা করেছেন যার আলোকে যেকোন যুগের যেকোন সমাজের নর নারী তাদের নিজ নিজ চাহিদা মোতাবেক অধিকার ও দায়িত্ব নিজেরাই নির্ণয় করবে। এ ব্যাপারে নর ও নারী উভয়কেই কোরানী মূল নীতি মোতাবেক নিজেদের অধিকার নিশ্চিত করণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কোরানের এই আয়াতটি আবার উল্লেখ করছি—

> "নারীদের উপর যেমন দায়িত্ব রয়েছে তেমনি তাদের অধিকারও রয়েছে।"

এখানে অধিকার বলতে আল্লাহ সব রকমের অধিকারকেই বুঝিয়েছেন, যা সাধারণ ভাবে জানা ও বুঝা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় বিষয়াবলি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অবশ্য সব ব্যাপারে এটা লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন ক্ষেত্রেই যেন আল্লার নির্দ্ধারিত সীমার লংঘন না হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের পারস্পারিক ব্যাপারাদির নিষ্পত্তি বা সমস্যাবলির সমাধানে উভয়কে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা দিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরস্পর মিলেমিশে থাকবে এবং কেউ কারো উপর অন্যায় অবিচার বা যুলুম অত্যাচার করবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। এ ব্যাপারে ইসলাম স্বামী স্ত্রীকে পারস্পারিক সমঝোতার নীতি মেনে চলতে উৎসাহিত করে।

এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও পারস্পারিক পরামর্শ ও সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা নিম্নের আয়াতটির উল্লেখ করেন—

> "যে পিতা চায় যে তার সন্তান পুরো রেজায়াতের মীয়াদ পর্যন্ত দুধ পান করুক তাহলে মা তার শিশুকে পুরো দুবছর দুধ পান করাবে। এমতাবস্থায় শিশুর পিতাকে প্রচলিত পন্থায় তাদের খাদ্য-বস্ত্র দিতে হবে। কিন্তু কাউকে তার ক্ষমতার চেয়ে বেশী দায়িত্ব চাপানো উচিৎ নয়; মাকে এ জন্যে কষ্টে ফেলতে নেই যে শিশুটা তার, এবং পিতাকেও একই কারণে বিরক্ত করা যাবেনা যে শিশুটা তার। দুধ পানকারিনীর এই অধিকার যেমন শিশুর পিতার উপর রয়েছে তেমনি তার উত্তরাধিকারীর উপরও রয়েছে।

কিন্তু উভয়পক্ষ পারস্পারিক সন্তুষ্টি এবং পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াতে চাইলে—এমন করাতে কোন বাধা নেই।" (বাকারা—২৩৩)

আগেই বলেছি এখানে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী সম্পর্কে বলা হয়েছে। সে যদি তার সাবেক স্বামীর সন্তানকে দুধ পান করা এবং উভয়ে যদি পাস্পরিক শলা-পরামর্শ মোতাবেক এটা সিদ্ধান্ত নেয় যে দুবছর পুরণের আগেই শিশুর দুধ ছাড়িয়ে নেবে তাহলে তাতে কোন বাধা নেই। কিন্তু উভয়ের সমঝোতা ছাড়া যদি কোন একজন এই সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা করার অধিকার তাদের কারো থাকবে না।

এ থেকে এটা বুঝে দেখুন যে, ইসলাম যদি তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর সাথেও এমন সমঝোতাপূর্ণ ব্যবহার করার আদেশ দেয় তাহলে স্ত্রীর সাথে সমঝোতার উপর যে কতো গুরুত্ব আরোপ করে তা সহজেই অনুমেয়।

নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য

পারিবারিক ব্যবস্থাবলিকে ইসলামী ছাঁচে পরিচালনার জন্যে ইসলাম তিনটি বুনিয়াদ সরবরাহ করেছে। এই তিনটি বুনিয়াদ অর্থাৎ "সুবিচার" 'সমতা' ও পাস্পারিক পরামর্শ" নিয়ে আমরা উপরে আলোচনা করছি। এবার আমরা এই নিয়ে আলোচনা করবো যে পারিবারিক ব্যবস্থা বা প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করা উচিৎ—পুরুষের উপর না কি নারীর উপর? এর জবাবে কোরান এই ভারী দায়িত্বটি পুরুষের উপর ন্যাস্ত করেছে। দৈহিক ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির স্বাভাবিকতার দৃষ্টি-কোণ থেকে কোরান পুরুষের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করে সঠিক সিদ্ধান্তই দিয়েছে। আমাদের জ্ঞান বুদ্ধিতেও সিদ্ধান্তটি যথার্থ মনে হয়। এছাড়া পুরুষই সন্তানের পিতা হয়ে থাকে এবং বংশ বিস্তারের ধারাবাহিকতায় তার ভূমিকা গুরুত্বর, তাই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত হওয়াই স্বাভাবিক! এর সাথে সাথে পরিবারের সকলের ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থাবলি তত্বাবধানের দায়িত্ব সেই পালন করে থাকে; এ জন্যে জ্ঞানবুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী মোতাবেক পুরুষকেই পরিবার পরিচালনার দায়িত্ব সোপর্দ করা উচিৎ।

অন্যদিকে পুরুষই হয় ঘরের মালিক। পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ তাদের সুখ সুবিধে ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে লালন-পালনের সব দায়িত্ব পুরুষকেই পালন করতে হয়। এসব ভারি দায়িত্ব নিজ থেকেই যেন ঘোষণা করেছে যে...পরিবারের প্রধান পরিচালক নারীর পরিবর্তে পুরুষই হবে। কারণ ঘরে বাইরের এতো বিরাট দায়িত্ব পালন করা নারীর স্বাভাবিক সক্ষমতার অতীত ব্যাপার। তবে নারী তার শলাপরামর্শ দিয়ে পুরুষকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। এভাবে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক শলাপরামর্শ ও সহ-যোগিতার ভিত্তিতে পারিবারিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিবার পরিজন বিশেষ করে সন্তানদের আয় উপার্জন করে খাওয়ানোটাই শুধু তার দায়িত্বের অংশ নয় বরং সমাজের দুষ্টুজন থেকে বাঁচিয়ে রেখে তাদেরকে সততা ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাটাও তার অন্যতম কর্তব্য। এ জন্যে

ইসলাম নারীকে সংসারের বিভিন্ন কাজে স্বামীকে সহায়তা ও পরামর্শ দানের সাথে সাথে এই নির্দেশও দান করে যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে যেন এমন কোন লোককে ঘরে আসার অনুমতি না দেয় যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে।

বলা বাহুল্য ইসলামের নির্দেশিত পথে নারীর কোন রকম অধিকার খর্ব হয় না এবং নারীর উপর কোন রকমের জুলুম অত্যাচারের আশংকাও থাকে না।

পুরুষের এই স্বাভাবিক প্রাধান্য স্বীকৃত বলেই বিয়ের পর স্ত্রীকে মাতা-পিতার ঘর ছেড়ে স্বামীর ঘরে আসতে হয়; এ জন্যে বিভিন্ন ব্যাপারে তাকে স্বামীর সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং জীবন যাপনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে স্বামীর ইচ্ছের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়।

স্ত্রী স্বামীকে বিশেষ কোন স্থান বা শহরে থাকার জন্যে বাধ্য করবেনা, বরং স্বামীকে তার সুযোগ সুবিধা মোতাবেক আয় উপার্জনের জন্যে যে কোন স্থান বা শহরে বসবাস করার অধিকার দিতে হবে। এব্যাপারে স্বামীর কর্তব্য হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার স্ত্রীর নেই।

এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থেই পুরুষকে পরিবারের প্রধান হিসাবে কাজ করার বর্দ্ধিত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নারীর গুরুত্ব বা মর্য্যাদাকে খর্ব করা হয়নি বা এতে নারীর অবমান না করার কোন অবকাশও নেই। এর মাধ্যমে নারীকে বরং জটিল ও কষ্টকর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। মোট কথা যে ক্ষেত্রে যে কর্মটি পুরুষের দ্বারা অধিকতর সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পালন করা সম্ভব শুধু সে ক্ষেত্রে পুরুষের ওপর বর্দ্ধিত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক আসলে একান্ত আবেগ নির্ভর হয়ে থাকে। এখানে একে অন্যকে অন্তরের গভীর উপলব্ধি সহকারে ভালবাসে। এই ভালবাসা তাদেরকে করে দেয় সম্পূর্ণ একাত্ম। স্বামী স্ত্রী যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন তাদের মনে কোন বাহ্যিক প্রভাব বা আনুষ্ঠানিক আইনবিধির ছায়াপাত হয় না। আইন কানুনের অনেক উর্দ্ধে এক অপার্থিব প্রেম প্রীতির বন্ধনে দুজন থাকে আবদ্ধ। তারা তখন কোন নীতি বা পারিভাষিক সাম্য সুবিচার ইত্যাদির লৌকিক আয়ত্বাধীনে থাকেনা। তখন এ কথা চিন্তা করাই

তাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে যে পরিবারের প্রধান কে ? প্রেম প্রীতি, অকৃত্রিম ভালবাসার সেই মধুর পরিবেশে এসব প্রশ্ন নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়। প্রেমই হয় তখন মুখ্য বিষয়, আর সব কিছু নিছক লৌকিকতা—নিছক আনুষ্ঠানিকতা। প্রেমপ্রীতির সেই পরিবেশে নীতি-বাক্য বা তত্ত্বকথার স্থান একান্তই গৌণ। ইসলাম এই স্বাভাবিকতাকে স্বীকার করে এবং গুরুত্ব দেয়।

স্বামী স্ত্রীর এই যে ভালবাসা, এই যে ত্যাগতিতিক্ষার অনুভূতি তা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এক্ষেত্রে স্বামী যদি অবস্থাপন্ন হয় তাহলে সে নিজ তাগিদেই স্ত্রীর যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দের পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করে রাখে। আর স্বামী যদি দরিদ্র হয় তাহলে পতিব্রতা স্ত্রী শুধু যে ধৈর্যধারণ করে তাই নয় বরং বিভিন্ন উপায়ে স্বামীকে সাহায্য সহযোগিতাও করে থাকে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রী ঘরের বাহিরের দায়িত্ব পালন করেও স্বামীকে সহযোগিতা দান করে।

এমন পতিব্রতা এক স্ত্রীর বাস্তব দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের (রা) মেয়ে হযরত যুবাইয়ের আসমার (রা) দৃষ্টান্ত। তিনি ছিলেন হযরত যুবাইর বিন আওয়ামের (রা) স্ত্রী। হযরত যুবাইয়ের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা। সুতরাং হযরত আসমা (রা) স্বামীর সাহায্য সহযোগিতা কিভাবে যে করতেন তা তাঁর নিজের মুখেই শুনুন--তিনি বলেন--"যুবাইয়ের (রা) ঘরের সব কাজকর্ম আমিই করি। তাঁর ঘোড়াকে ঘোড়াশালে বাধি, ঘাস দিই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নও করি। পানি ভরে এনে তাকে পানি খাওয়াই আর পানিও আনি তিন ফারলং দূর থেকে মাথায় বয়ে.....।"

এই যে তিনি স্বামীকে পারিবারিক কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন--তা কোন আইন-কানুনের অধীনে নয়, বরং এসব কাজ করতেন তিনি স্বমীর প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং একাত্মতার আবেগ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েই।

—

পুরুষের দায়িত্বশীলতা

ইসলামী সমাজে স্ত্রীর উপর পুরুষকে দায়িত্বশীল বানানোর বুনিয়াদ হচ্ছে কোরান শরীফের এই আয়াত—

> "পুরুষ নারীদের উপর দায়িত্বশীল রয়েছে, এই ভিত্তিতে যে আল্লাহ্ এদের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং এই ভিত্তিতে যে পুরুষ তার ধনসম্পদ ব্যয় করে।"
>
> (নিসা-:৪)

এই দায়িত্বশীলতা দু'প্রকারের :

(১) বস্তুগত ও বাহ্যিক অনুভবজনিত (২) আভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক। **প্রথম—বস্তুগত :** আমরা দেখি যে পুরুষ আয় উপার্জন করে এবং নারীর জন্যে খাদ্য বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থাদি করে। একে আমরা অনুভবজনিত দায়িত্বশীলতা বলি, যা আমরা বাইরে থেকেও দেখতে পাই। আভিধানিক ভাবেও দায়িত্বশীলতার এই অর্থ দাড়ায়। পবিত্র কোরানে আল্লাহ "কাওয়াম" শবদটি ব্যবহার করেছেন। আর বিখ্যাত আরবী অভিধান "আল-কামুস আল মুহিত" এ "কাওয়াম" এর অর্থ করা হয়েছে--"পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর দায়িত্ব গ্রহণ করা, তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা এবং তার বিষয়াদি তত্বাবধান করা।" এভাবে আভিধানিক দিক থেকেও পুরুষ নারীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং আল্লার কোরানের অর্থও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবেও পুরুষ নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশুনা করে থাকে। কারণ দৈহিক ও প্রাকৃতিক ভাবেও নারীকে এমন অনেক পর্য্যায় অতিক্রম করতে হয় যখন নারী পুরুষের শরণ নিতে বাধ্য হয়ে পড়ে। বিশেষ করে গর্ভাবস্থা ও শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় নারী এতোটা দুর্বল হয়ে পড়ে যে অনেক সময়

তার চলাফেরা করাটাও দুষ্কর হয়ে পড়ে। সে সময় সে স্বাভাবিক ভাবে যেকোন পুরুষের সহযোগিতা কামনা করে যে তার নিরাপত্তা ও স্বার্থের তত্ত্বাবধান করে। নারীদের এই প্রাকৃতিক অক্ষমতা ও অসহায়তার কারণেই ইসলাম কেবল পুরুষদের উপরই জিহাদ ফরজ করেছে এবং জিহাদের গুরুদায়িত্ব থেকে নারী সমাজকে মুক্তি দিয়েছে। এভাবে প্রাকৃতিক ভাবেই পুরুষ নারীর স্বার্থ সংরক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের জন্যে দায়িত্বশীল।

দ্বিতীয়—আধ্যাত্মিক ঃ এটাকে আমরা অন্য শব্দে চারিত্রক বা আভ্যন্তরীণ দায়িত্বশীলতাও বলতে পারি। পবিত্র কোরানের বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থের দিকেও ইঙ্গিত করে। এখানে একটি দারুণ বিভ্রান্তি ও অপবাদের অপনোদন করাও জরুরী যে, কোন কোন মানসিক ব্যাধিগ্রস্থ ও জ্ঞানপাপী লোক এই আয়াতের উল্লেখ করে এটা বুঝাবার অপচেষ্টা করেন যে, ইসলামে নারীর ব্যক্তিত্বের কোন গুরুত্ব নেই এবং তাকে মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। অন্যদিকে সব অধিকার পুরুষকেই দান করেছে যাতে নারীদের উপর শোষণ অব্যাহত রাখা যায়। বস্তুতঃ এটা একটা অজ্ঞতাপূর্ণ অভিমত। ইউরোপীয় পন্ডিতরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে এধরণের ভিত্তিহীন অপবাদ রটিয়ে থাকে। কিন্তু আমরা যেমন আগেই উল্লেখ করেছি পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যে ইসলাম পুরুষ ও নারী উভয়কে একই রকমের অধিকার ও গুরুত্ব দিয়েছে এবং এক্ষেত্রে সমতা, সুবিচার ও পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে পারিবারিক প্রশাসন পরিচালনার আদেশ দেয়। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের কোন পর্যায়ে নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করার বা তার মর্যাদা খাটো করার কোনরকম প্রশ্নই উঠতে পারে না। যে ইসলাম নারীকে যুগযুগের শোষণ ও লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর অক্টোপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই ইসলামের বিরুদ্ধে যারা এধরনের ভিত্তিহীন অপবাদ রটনা করে বেড়ায়—তাদের মানসিক বিকৃতি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে কি? নিঃসন্দেহে ইসলাম দুনিয়ার নারী

সমাজকে শত-শতাব্দীর জুলুম নিষ্পেষণের কবল থেকে চিরমুক্তি দান করেছে।

ইসলাম পুরুষকে নারীর ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ ব্যবহারেরও অনুমতি দেয়না। নারী তার ব্যক্তিগত ধনসম্পদ নিজেদের ইচ্ছামতো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার রাখে। এক্ষেত্রে যদি পুরুষ কোনরকমের অনধিকার চর্চা করতে চায় তাহলে নারী তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে গিয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারও রাখে।

আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবী করতে পারি যে ইসলাম নারীকে যে অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে তা আজ পর্যন্ত কোন ধর্ম বা মতবাদে দেয়া হয়নি। এমনকি নারী স্বাধীনতায় তথাকথিত চাম্পিয়ান আধুনিক পাশ্চাত্যেও নারী তার সত্যিকার অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। এই অতি সম্প্রতিকালে যেসব দেশে নারীর কোন কোন অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে মাত্র। বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে একমাত্র ইসলামই সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে তার যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা দিয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বের গুরুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র মোতায়েন করে দিয়েছে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে ইসলাম পুরুষকে তার স্ত্রীর ধর্ম বা মতবাদ পরিবর্তন করার ব্যাপারে জোরজবরদস্তি করার অধিকারও দেয়না। যেমন স্ত্রী যদি ইহুদী ধর্মাবলম্বিনী হয়ে থাকে তাহলে সে তার উপর টিকে থাকার অধিকার রাখে, আর যদি খৃষ্টান ধর্মমতে বিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহলে তাতেও স্বামীর জোরজবরদস্তি করার কিছু নেই। স্ত্রীর ধর্মের উপর আপত্তি বা নিন্দনীয় কিছু বলার এক্তিয়ারও স্বামীর নেই। স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তনের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারবে না। পবিত্র কোরানে নারীর এই অধিকার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

> "আজ তোমাদের জন্যে সব পবিত্র জিনিষকে হালাল করে দেয়া হল। তাহলে আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্যে; এবং সংরক্ষিত মহিলারাও তোমাদের

জন্যে হালাল তা তারা ঈমানদারদের মধ্য থেকে হোক বা ওসব জাতির যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে তোমরা তাদের মোহর আদায় করে বিয়ের মাধ্যমে তাদের সংরক্ষক হও। এটা নয় যে স্বাধীন ব্যাভিচার করতে শুরু করবে অথবা লুকিয়ে পালিয়ে পিরিত করবে।" (মায়েদা—৫)

সুতরাং আহলে কিতাবের কোন নারী যদি মুসলমান স্বামীর স্ত্রী হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার ধর্ম পরিবর্তন করার জন্যে বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য সে যদি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করতে চায় তাহলে অন্য কথা। কেননা, আল্লাহ এটাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে "দ্বীনে (ইসলামে) কোন জোর-জবরদস্তি নেই।"

এখন বলুনতো যে ইসলাম, নারীকে তার ধনসম্পদ এবং ধর্ম ও বিশ্বাসের এতোটা স্বাধীনতা দান করেছে এবং অন্যান্য সব অধিকার ও সমতা দান করেছে তার ব্যাপারে এটা কল্পনা করাও কি সম্ভব যে সেই ইসলাম নারীকে পুরুষের হাতে শোষিত হবার সুযোগ দেবে? তাহলে ওসব জ্ঞানপাপী পন্ডিতরা কোন যুক্তিতে বলে যে ইসলাম পুরুষকে নারীর উপর অন্যায় কর্তৃত্ব করা বা নারীর অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ দিয়েছে?

আসলে পুরুষকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ের বর্দ্ধিত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে—যা মানব প্রকৃতির দাবী মোতাবেক একান্তই যুক্তিযুক্ত। এরই মধ্যে একটি ক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক দায়িত্ব। এ সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

অন্য আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে সামরিক নেতৃত্ব। এর মাধ্যমে সে শত্রুর হামলা থেকে কোনও জাতির স্বার্থ ও মান মর্যাদা রক্ষা করে এবং প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতেও পিছপা হয় না। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে দেখতে পাবেন যে নারীসুলভ স্বাভাবিক দুর্বলতা ও বিশেষ প্রাকৃতিক অসুবিধার কারণে নারীরা যথার্থভাবে সামরিক দায়দায়িত্ব পালনে অক্ষম। কিন্তু এব্যাপারে পুরুষদের বিশেষ ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে সামরিক ক্ষেত্রেও পুরুষের উপরই অধিকতর গুরুদায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে।

নারীদের কয়েকটি স্বাভাবিক দুর্বলতা লক্ষণীয় ঃ

(১) মাসিক ঋতু অর্থাৎ হায়েজ, প্রসবকালীন নেফাস, গর্ভধারন ও প্রসব, শিশুকে দুধ খাওয়ানো, সন্তানের লালনপালন ও অন্যান্য পারিবারিক কাজ-কর্মে রাত-দিনের ব্যস্ততা ইত্যাদি এমন কিছু রুটিন থাকে নারীর নিত্যদিনের আজীবন সাথী বলা যেতে পারে। অন্যদিকে পুরুষরা স্বাভাবিকভাবেই এসব কর্মব্যস্ততা থেকে মুক্ত। সেজন্যে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দায়িত্ব পুরুষের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছে।

এছাড়া আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সব যুগেই নারী দৈহিক শক্তির দিক থেকে পুরুষের তুলনায় দুর্বল প্রমাণিত হয়ে আসছে। তাদের দেহ অধিক পরিশ্রম ও কঠোরতা সহ্য করতে অক্ষম, পুরুষের তুলনায় তাদের শক্তি সাহসও কম।

(২) গৃহস্থালী কাজকর্মে তাদের অভিজ্ঞতাও খুব কম থাকে। তাদের কর্মক্ষেত্র, ঘরপরিবার ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পর্যন্তই সীমিত। অন্যদিকে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে বাইরের ব্যবকতায় পরিব্যপ্ত। এই ব্যাপক ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা এবং বৈষয়িক জ্ঞান পুরুষরই বেশী থাকে। বিভিন্ন কলাকৌশল ও উপায় উদ্ভাবন সম্পর্কে পুরুষই বেশী ওয়াকেপহাল। এজন্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে বুদ্ধিগত ও শারীরিক শক্তির পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক।

(৩) নারীকে তার সন্তানের লালন পালন ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে কোন রকমের অসাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি বা শক্তির প্রয়োজন হয় না বরং প্রাকৃতিকভাবে যে নম্রতা-সরলতা ও সহজ আবেগ উপলব্ধি সে পেয়েছে তাই তার জন্যে যথেষ্ট। শিশুর সাথে শিশু হয়ে থাকতেই তার প্রকৃত আনন্দ। তাই শিশুর মতোই তার মনমানসিকতা। সে শিশুর মতোই হয় সৌন্দর্য ও কোমলতা প্রিয়। তার জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনাও অনেকটা শিশুসুলভ। এমনকি শিশু-সুলভ কথা বলতে এবং শিশুর মতো অঙ্গভঙ্গি করতেই তার স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। বিধিবিধান, শৃংখলা ও গম্ভীর নীতি তত্ত্ব ইত্যাদির দিকে নারীর

আকর্ষণ কমই দেখা যায়। অথচ এসব ব্যাপারে পুরুষের আবেক উদ্দীপনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পুরুষদের মধ্যে চেষ্টা সংগ্রাম, নীতি, তত্ত্ব, গভীর বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞানপিপাসা এবং শক্তি ও সাহসিকতার মনোভাব দেখা যায়। নারী পুরুষদের মধ্যেকার এসব গুণবৈশিষ্টের বিভিন্নতা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন যেন তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে পরিপূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

এতে করে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে নারী সৃষ্টির প্রথম থেকেই শান্ত, কোমল, সংবেদনশীল ও সৌন্দর্য্য প্রিয় স্বভাবের অধিকারী। আর পুরুষ শক্তিমত্তা, সংগ্রাম-সাধনা জ্ঞানবুদ্ধি-ইচ্ছাশক্তি ও কর্মকৌশলের অধিকারী।

নারীর তুলনায় পুরুষের এসব ব্যতিক্রম গুণবৈশিষ্ট্য এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির প্রাধান্য একটা সর্বজন স্বীকৃত সাধারণ সত্য কথা। এজন্যে বুদ্ধিগত ও প্রাকৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে পরিবারের প্রধান দায়িত্বশীল করাটাই যুক্তিসংগত।

এরপর এটাও তো জানা কথা যে দুনিয়ার যত বিপ্লব, যত সংস্কার ও সংশোধনী আন্দোলন এবং গণসংগ্রামের নেতৃত্ব সবসময় পুরুষই দিয়ে আসছে তারই ফলশ্রুতিতে পুরুষরা আজীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে বরাবরই এগিয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে তার জ্ঞানও অবগতি রয়েছে বিস্তর। সামরিক শক্তি ও কলাকৌশলের ক্ষেত্রেও তার অভিজ্ঞতাই বেশী। এসব কারণে পুরুষরাই আদিকাল থেকে সমাজের ভালমন্দ দেখাশুনা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে।

এভাবে জীবনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যখন তার যোগ্যতা ও নেতৃত্ব সর্বজন স্বীকৃত তখন ছোটখাট ব্যাপারে যে তার প্রাধান্য থাকবে তাতো স্বাভাবিকই সে যেমন পরিবারের দেখাশুনা করে তেমনি রণাঙ্গণে গিয়ে যুদ্ধ করে, বিপ্লবী আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে এবং সরকার বা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বও পালন করে। এসব প্রত্যক্ষ বাস্তবতার আলোকে নারীর উপর পুরুষকে দায়িত্বশীলকরণ সংক্রান্ত কোরানী আয়াতের আসল তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজকাল নবজাগৃতি ও প্রগতিশীলতার নামে যেসব কথা বার্তা শোনা যাচ্ছে তা কোন নতুন কথা নয়। প্রিয়নবী (স)র যুগেও কিছু সংখ্যক মহিলা তাঁদেরকে পুরুষের বরাবর মর্যাদা দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যেমন হযরত উম্মে সালমা (রা) একবার কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে প্রিয় নবী (স)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন করেন যে—"হে, আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপরও যদি জিহাদ ফরজ করে দেয়া হতো যেমন পুরুষদের উপর রয়েছে তাহলে আমরাও পুরুষদের বরাবর পুরস্কার ও প্রতিদান পেতাম—।" তাদের সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোরানের এই আয়াত নাজিল হয়—

> "আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী দিয়েছেন তার আকাংখা করোনা। যা কিছু পুরুষরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ।" (নিসা—৩২)

এটা বলে আল্লাহ সামাজিক বিশৃংখলার পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। নারীদের পক্ষে পুরুষদের জন্যে নির্দ্ধারিত কর্মে হস্তক্ষেপ করা ভুল। কারণ এতে করে প্রকৃতির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবার আশংকা থাকে। সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে মানবজীবন গড়ে তোলার জন্যে আল্লাহ যে আইন প্রবর্তন করেছেন—একে অন্যের কর্মে হস্তক্ষেপ করার ফলে তার উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য আলাদা আলাদাভাবে বন্টন করে রেখেছেন এবং সে হিসেবে তাদের প্রতিদান ও পুরস্কারের ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থাও করে রেখেছেন। তারই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন—

> "যেমন কর্ম পুরুষ করবে সেই মোতাবেক তাদের প্রতিদান দেয়া হবে এবং যেমন কর্ম নারী করবে সেই মোতাবেক তাদের প্রতিদান দেয়া হবে।" (নিসা—৩২)

আর এই প্রতিদান বা পুরস্কার শুধু জিহাদ বা এধরণের অন্যান্য কর্মের জন্যে নির্দ্ধারিত নয় বরং পুরুষের জন্যে জিহাদের যে পুরস্কার সে একই পুরস্কার নারীকে তার নির্দ্ধারিত কাজের জন্যে দেয়া হবে। সুতরাং নারীকে নারীর কাজেই মনোযোগ দেয়া উচিৎ আর পুরুষ তার নিজের কাজে মন দেবে। পর-

স্বপর কারো কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করবে না। কারণ তাতে করে শুধু বিশৃংখলাই সৃষ্টি হবে। তাছাড়া তা হবে আল্লার পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপেরই নামান্তর এবং প্রাকৃতিক বিধিবিধানের পরিপন্থী কর্ম।

প্রিয়নবী (স) নরনারীকে এই বিশৃংখলার হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। যেসব মহিলা এই স্বাভাবিক বিধিবিধানকে অমান্য করে সীমালংঘন করে পুরুষালী বেশ গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি অভিসম্পাৎ করেছেন। একই ভাবে নারীর বিশেষ কর্মক্ষেত্রে পুরুষের হস্তক্ষেপও অবাঞ্ছনীয়। বস্তুতঃ নারীকে তার নিজ ক্ষেত্রে নিজ দায়িত্ব পালন করেই কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে। প্রকৃতি তার জন্যে যে কর্মসীমা নির্দ্ধারণ করেছে সেটাই তার জন্যে উপযুক্ত স্থান। আল্লাহ তার জন্যে তার যোগ্য ক্ষেত্র ও কর্ম মোতায়েন করে দিয়েছেন, এটাই স্বাভাবিক বিধি, আর এরই উপর নির্ভর করছে সমাজের স্বাভাবিক উন্নতি ও অগ্রগতি।

নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা

আমরা আগেই বলেছি, নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য ও দায়িত্বশীলতার অর্থ এই নয় যে পুরুষ নারীর উপর শোষণ-জুলুম করবে বা তার অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে। আসলে পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে শুধু বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের তাগিদে। এর উদ্দেশ্য পুরুষের আলাদা কোন মর্যাদা বা বৈশিষ্ট্য দান করা নয়। আল্লার কোরানের আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এটা নয় যে পুরুষ মর্যাদা ও গুরুত্বের দিক থেকে নারীর উপরে, না তা নয়। অধিকার মর্যাদা ও গুরুত্ব নারী পুরুষের বরাবরই। তবে প্রাকৃতিক কারণে তার উপর শুধু দায়িত্বটাই বেশী ন্যস্ত করা হয়েছে। কোরান নারী ও পুরুষের একই গরুত্ব ও মর্যাদার উল্লেখ করে ঘোষণা করেছে যে "উভয় একই উপাদান থেকে সৃষ্ট।" যেমন আল্লাহ্ বলেছেন—

> "জবাবে তাদের প্রতিপালক বললেন—"আমি তোমাদের মধ্যে কারো কর্ম বিফল করি না—তা নারী হোক বা পুরুষ, তোমরা সবাই একে অন্যের সম-অস্তিত্ব।" (মায়েদা—১৯৫)

এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পুরুষকে নারীর উপরে বিশেষ কোন মর্যাদা বা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। পুরুষ ও নারীর পার্থক্য ঠিক একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের পার্থক্যের মতোই। দেহের কোন কোন অঙ্গ অন্যের তুলনায় বেশী কাজ করে, কিন্তু তাই বলে তার প্রাধান্য বা বিশেষ মর্যাদা নেই। দেহের সব অঙ্গই সমান গুরুত্বের অধিকারী। নর ও নারীর অবস্থাও ঠিক একই রকম। আল্লার কাছে মর্যাদা শুধু তারই বেশী হবে যে সৎ ও খোদাভীরু—তা সে নারী হোক বা নর। এছাড়া আল্লার দরবারে দৈহিক পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নেই। এরই দিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ বলেছেন—

> "আর যা কিছু আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী দিয়েছেন তার আকাংখা করো না। যা কিছু পুরুষরা আর

করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ রয়েছে, আর যা কিছু নারীরা আয় করেছে সে অনুযায়ী তাদের অংশ। হ্যাঁ, আল্লার কাছে তাঁর দয়া কামনা করতে থাক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" (নিসা ঃ ৩২)

এথেকে আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পুরুষের প্রাধান্যটা কেবল বাহ্যিক অনুভবজনিত দায়িত্বের ক্ষেত্রেই সীমিত। নয়তো মানুষ হিসেবে তার গুরুত্ব ততটুকুই যতটুকু একজন নারীর রয়েছে। একই অর্থবোধক অন্য আয়াত হচ্ছে –

"এবং দেখ, আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কাউকে কারো উপর রিযিকের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছেন। (নাহল ঃ ৭১)

এখানে রিযিকের বাড়তি-কমতির আইনবিধি বর্ণনা করে আল্লাহ কারো মানমর্যাদা হ্রাস-বৃদ্ধি করছেন না। আসলে এটা হচ্ছে এমন এক স্বভাব সম্মত পারস্পারিক নির্ভরশীল বন্টন ব্যবস্থা – যাতে সব লোক একে অন্যের সেবায় আসতে পারে।

মোটকথা এই যে সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়ের পৃথক পৃথক মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করে দেয়া হয়েছে। এখন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে যে রকম আন্তরিকতা, পরিশ্রম ও সৎ উদ্দেশ্যে পালন করবে আল্লার দৃষ্টিতে তার ততটুকু গুরুত্ব ও মর্যাদা পাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রী সংখ্যা

"আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যাভিচারী পুরুষ এবং ব্যাভিচারী নারীকে পছন্দ করেন না। (দারকুতনী, তাবরাণী, দায়লমী)

উপস্থাপনা

ইসলাম প্রাচীন যুগীয় ও যাযাবরীয় যে কয়টি প্রচলনকে নির্দোষ মনে করে অবশিষ্ট রেখেছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে একাধিক স্ত্রী সম্পর্কীয় বিষয়। বহু-বিবাহের প্রচলন ইসলামের আগেও গোটা দুনিয়ার সভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতিসমূহ বিশেষ করে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে স্ত্রীসংখ্যার উপর কোন রকমের বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিলনা। তখন যার যত মর্জি স্ত্রী রাখার স্বাধীনতা ছিল। এটাকে কেউ কোনদিন মন্দ ভাবেনি। এ ধরনের অবস্থাতেই বিশ্বমানবতার সামনে ইসলামের আবির্ভাব ঘটে। ইসলাম যেহেতু সর্বমানবতার সামগ্রিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্যে এসেছে তাই সেহেতু বহুবিবাহ সংক্রান্ত বিষয়-টিও ইসলামের বিবেচনাধীনে আসে। ইসলাম এটাকে সম্পূর্ণ হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণাও করেনি আবার তার খোলা অনুমতিও দেয়নি বরং বহু বিবাহের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করে তাকে শর্তসাপেক্ষ করে দিয়েছে যেন বহুবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং কেবল কল্যাণকর দিকটি অব-শিষ্ট থাকে।

ইসলাম বহুবিবাহের উপর যে বিধি-নিষেধ ও শর্ত আরোপ করেছে তা কোরানের বর্ণনা মোতাবেক –

"যে সব নারী তোমাদের পছন্দ হয় তাদের মধ্য থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনের সাথে বিয়ে কর। কিন্তু যদি তোমার আশংকা

হয় যে তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে কেবল একটি স্ত্রীই রাখ অথবা ওসব নারীকে স্ত্রীত্বে আন যারা তোমার অধিকারে এসেছে ; অধিকার থেকে বাঁচার জন্যে এটা অধিকতর ভাল।"

(নিসা—৩)

একাধিক স্ত্রীর উদ্দেশ্য যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়

এই বিষয়ে অধ্যয়ন করার আগে যেসব বুনিয়াদী জ্ঞান অর্জনের একান্ত দরকার তা এই যে ইসলামে বিয়ের উদ্দেশ্য নিছক যৌনতৃপ্তি অর্জন নয় বরং মানব অস্তিত্বের ধারা অব্যাহত রাখা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

"এখন তোমরা নিজের স্ত্রীদের সাথে রাত্রি যাপন কর এবং সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন।" (বাকারা—১৮৭)

ইসলামী বিশেজ্ঞরা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন—এই আয়াতে সহবাসের উদ্দেশ্য যৌনতৃপ্তি অর্জনের কথা বলা হয়নি বরং এর উদ্দেশ্য মানব বংশধারা অব্যাহত রাখার কথা বলা হয়েছে। কারণ—"সেই উপকার অর্জন কর যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে লিখে দিয়েছেন"এর এই অর্থই দাঁড়ায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। এক ব্যক্তি প্রিয়নবী (স)র দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো যে, "হে আল্লার রাসুল! একটি মহিলা খুবই সুন্দরী-রূপসী। কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাকে বিয়ে করবো? প্রিয় নবী (স) জবাবে বললেন--"না। দ্বিতীয়বার সে ব্যক্তি আবার উপস্থিত হয়ে নিজের আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলো। প্রিয়নবী (স) আবার নেতিবাচক জবাব দিলেন। তৃতীয়বার সে ব্যক্তি আবার উপস্থিত হয়ে সেই পুরনো প্রশ্নই করলো। এবারও প্রিয়নবী (স) বললেন--"না। এমন মহিলার সাথে বিয়ে কর যে সুন্দরী-রূপসী হবার সাথে সাথে সন্তান উৎপাদনও করতে পারে যেন রোজ হাশরে আমি আমার উম্মতেরআধিক্যের উপর গৌরব করতে পারি।"

আমরা এটা অবশ্য জানিনে যে প্রশ্নকর্তা ব্যক্তিটি বিবাহিত ছিল, নাকি অবিবাহিত। কিন্তু সে যে মেয়ে লোকটির রূপে এতই জমে গেছিল যে সে বন্ধ্যা জানা সত্বেও তাকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু প্রিয়নবী (স) তা করার অনুমতি দেন নি। আর এই অনুমতি না দেয়ার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে বিয়ের উদ্দেশ্য কেবল যৌনতৃপ্তি অর্জন করা নয় বরং বংশ বিস্তার লাভ করা। যেহেতু এই বিয়েতে বংশবিস্তারের কোন সম্ভাবনা ছিলনা তাই প্রিয়নবী (স) তার অনুমতি দেন নি। এখন প্রশ্নকর্তা বিবাহিত হয়ে থাকুক বা অবিবাহিত উভয় ক্ষেত্রেই একই যুক্তি কার্যকরী রয়েছে যে, ইসলামে বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বংশবিস্তার করা, যৌন সম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু যৌন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে বিয়ে করা অপসন্দীয়। যারা কেবল যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে তাদের উদ্দেশ্য করে প্রিয় নবী (স) বলেছেন---

> "আল্লাহতায়ালা সম্ভোগকারী পুরুষ ও সম্ভোগকারিণী নারীদের ভাল বাসেন না।

তাবরী ও দারেকুতনীতে একই বিষয়ভুক্ত অন্য এক হাদিসে প্রিয়নবী (স) বলেছেন---

> "বিয়ে কর এবং তালাক দিওনা, কেননা আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারীণীদের পসন্দ করেন না।

একাধিক স্ত্রী—নিছক অনুমতি মাত্র

উপরের হাদীস দুটির আলোকে আমরা কোরানে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতটি সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা সহজেই বুঝতে পারি যে একাধিক বিয়ের অনুমতিদানের উদ্দেশ্য কোন অর্থেই যৌনসম্ভোগ বা যৌনতৃপ্তি অর্জন নয়। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরের বিশেষজ্ঞবৃন্দ বলেছেন---এর অর্থ হচ্ছে দ্বিতীয় বিয়ে কেবল তখনই হালাল বা বৈধ হবে যখন তা করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে না।

অন্য কথায় শুধু বিশেষ অবস্থা যেমন প্রথম স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, বা এত বেশী রুগনা হয়ে পড়ে যে স্ত্রীত্বের স্বাভাবিক দাবীপূরণে অক্ষম থাকে, বা

দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস হয়ে পড়ে--তখন বিধবাও অবিবাহিতা নারীদের বৃহত্তর সার্থে সক্ষম ও সচ্ছল পুরুষরা-- একাধিক বিয়ের অনুমতি পাবে। তাও এই শর্তে যে তারা স্ত্রীদের সাথে সমতা ভিত্তিক ও সুবিচার পূর্ণ ব্যবহার করবে।

সীমা নির্দ্ধারণই উদ্দেশ্য—স্বেচ্ছাচারিতা নয়

কোরানের সেই আয়াত যাথেকে একাধিক বিয়ের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করা হয় তা আসলে লাগামহীন স্বেচ্ছাচারিতার সামনে সীমা নির্দ্ধারণ করার জন্যেই সামিল হয়েছে। সুতরাং কোরানের এই আয়াত—

> "আর যদি তোমার ভয় হয় যে এতীমদের সাথে সুবিচার করতে পারবে না তাহলে যেসব নারী তোমাদের পসন্দ হয় দুই দুই, তিন তিন এবং চার চারজনের সাথে বিয়ে কর কিন্তু যদি তোমার শংকা হয় যে তাদের সাথে সুবিচার করতে পরবে না তাহলে একটি স্ত্রীই রাখ অথবা ওসব নারীকে স্ত্রীত্বে নাও যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে, অবিচার থেকে বাঁচার জন্যে এটা অধিকতর ভাল"। (নিসা—৩)

কোরান বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, 'আরববাসীরা তখন এতীমদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণে এজন্যেই ঈতস্তত করতো যে ঘটনাচক্রে তাদের উপর যেন অবিচার অত্যাচার না হয়ে যায়। কিন্তু নারীদের বেলায় তাদের কোনরকম ইতস্তত বোধ ছিলনা। নারীদের সাথেও যে সুবিচার ও সমতাপূর্ণ ব্যবহার করা দরকার এটা তাদের কাছে দুর্বোধ্য কথা ছিল।

কোরানের আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়া হলো যে যুলুম অবিচার যার উপরই করা হোক না কেন তা যুলুম এবং অবিচার বলেই গণ্য হবে, তা এতীমদের উপর হোক বা নারীদের উপর। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষমতা ও সাধ্যের মধ্যে থেকে বিয়ে কর যেন প্রত্যেকের সাথে সমতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পার। এবং তোমাদের স্ত্রীদের সংখ্যা যত কম

হবে তাদের অধিকারও ততটা বহাল থাকবে এবং তোমরাও তাদের সাথে সুবিচার করতে পারবে।

আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা যামাখশরী বলেন—"তোমরা যদি এতীমদের অধিকারের ক্ষেত্রে অবিচার করতে না চাও এবং তাকে বিরাট পাপ মনে কর তাহলে নারীদের ব্যাপারেও সেই একই অনুভূতি পোষণ কর এবং কমসে কম বিয়ে কর, কারণ এতে করে নারীদের উপর অবিচার অত্যাচারের আশংকাও কমে যায়।" তাবারীর গ্রন্থকার ইবনে আববাস, সাঈদ বিন যুবাইর, কাতাদাহ এবং সিদ্দির বরাত দিয়ে এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—"অন্ধকার যুগেও লোকেরা এতীমদের ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাকে বিরাট পাপ মনে করতো; কিন্তু নারীদের ব্যাপারে তাদের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। তারা নারীর উপর যুলুম অত্যাচারকে মোটেই অনুচিত মনে করতোনা, সুতরাং এই আয়াতে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে, যেভাবে তোমরা এতীমদের ধনসম্পদ আত্মসাৎকে বিরাট পাপ মনে কর এভাবে নারীদের অধিকার ও সংরক্ষণ কর, আর এর সবচেয়ে উত্তম পন্থা হচ্ছে তোমরা খুব কম সংখ্যায় বিয়ে কর এবং একান্ত প্রয়োজন হলে চারটা পর্যন্ত স্ত্রী রেখো, এর চেয়ে বেশী কোন অবস্থাতেই নয়। আর যদি এটাও ভয়থাকে যে তোমরা চারজন স্ত্রীর সাথে সুবিচার করতে পারবেনা তাহলে শুধু একটা বিয়ে কর যার সাথে সমতাপূর্ণ ব্যবহার করতে পার। তাবারীর গ্রন্থকার এই ভাষ্যকে অন্যান্য ভাষ্যের তুলনায় অধিকতর পসন্দ করেছেন।

কিন্তু যেহেতু স্ত্রীদের ব্যাপারে সম্পর্কটা আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে সম্পৃক্ত এবং প্রত্যেক স্ত্রীকে একই দৃষ্টিকোন থেকে দেখা এবং একই রকম ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই জন্যে স্ত্রীদের সাথে সুবিচারের মানদন্ড হবে এইযে, কোন স্ত্রীকে বিশেষভাবে ভালবাসতে গিয়ে অন্য স্ত্রীর অধিকার খর্ব হবার আশংকা যেন না দেখা দেয়।"

কুরতবী যাহহাক এবং অন্যান্য মুফাস্সির থেকে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন। তার ইবারত হলো—"এই আয়াতে সুবিচার করার অর্থ হচ্ছে এই যে,

সব স্ত্রীদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তাদের মধ্যে কোনরকমের পার্থক্য করবে না ; এমন যেন না হয় যে, কাউকে অতিমাত্রায় ভালবাসবে এবং অন্যের জীবনকে দুঃখে ভরে দেবে। এটা করা শরীয়তের আইনে হারাম (নিষিদ্ধ)। রইলো আন্তরিকতার কথা। তা সবার সাথে একই আন্তরিকতার সমতা রক্ষা করা মানব প্রকৃতির বিরোধী"

যাইহোক, প্রকৃত পক্ষে এই আয়াত সেসব যুলুম অত্যাচারের অবসানের জন্য নাযিল হয়েছিল যা অন্ধকার যুগের লোকেরা একাধিক বিয়ে করে নারীদের উপর চালিয়ে থাকতো। আর এই আয়াতে একাধিক বিয়ের আদেশ দেওয়া হচ্ছেনা বরং নারীদের উপর সুবিচার প্রতিষ্ঠার উপরই বিয়ের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে মাত্র।

করতবী যাহহাক, তাবারী, যামাখশরী প্রমুখ এবং পূর্ববর্তীদের মধ্যে ইবনে আববাস, সাঈদ বিন জবীর, সুদ্দি, কাতাদাহ এবং অন্যান্য মুফাসসিররা এই আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। তাবারীতো এতটুকু বলেন যে, এই আয়াত বস্তুতপক্ষে অধিক বিবাহের উপর বিধিনিষেধ আরোপের উদ্দেশ্যেই নাযিল হয়েছে কেননা তাতে করে সুবিচারের পথ বন্ধ হয়ে যাবার ভীষণ আশংকা রয়েছে।

দারিদ্রে একাধিক স্ত্রী নিষিদ্ধ

পবিত্র কোরাণের কোন কোন আয়াতে একাধিক স্ত্রীর অনুমতি দেয়া হলেও সাথে সাথে অন্যান্য শর্ত শরায়েতও আরোপ করা হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা। সুতরাং আয়াতে বলা হয়েছে—"এটা তোমাদেরকে অভাব অনটন থেকে বাঁচানোর জন্যে এক উত্তম মাধ্যম" এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী বলে —আরবী "ভাষায় রাজুলুন-আয়েলুন" অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির অর্থে ব্যবহার করা হয়। এর মূল অক্ষর সমষ্টি হচ্ছে আইন-ওয়াও-লাম। এথেকে বহুবাচক আয়াল শবদ গঠিত হয়েছে। অর্থ হচ্ছে মানুষের সন্তানসন্ততি যত কম হবে তার

ব্যয়ও তত কম হবে। আর ব্যয় কম হলে মানুষ অনটনেও পড়বে না। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে একটিমাত্র বিয়ে করলে যেখানে অবিচার অত্যাচারের আশংকা থাকে না তেমনিতাতে করে দারিদ্রের আশংকাও করে যায়।

ইমাম শাফেয়ী এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন "পরিবার পরিজন কমানোর জন্য এটা উত্তম উপায়।"

অন্যান্য মুফাসসিররা এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন "নারীদের উপর অবিচার করা থেকে বাঁচার জন্যে এটা সবচেয়ে উত্তম পন্থা।" ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী এই অর্থ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করে বলেন যে অধিকাংশ মুফাসসিরের কাছে এটাই হচ্ছে পসন্দনীয় মত। কিন্তু ইমাম রাজী নিজে আগে গিয়ে কাজীর মাধ্যমে ইমাম শাফেয়ীর মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এভাবে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে ব্যক্তির আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকাটা শর্তসাপেক্ষ।

আভিধানিক অর্থের দিক থেকেও ইমাম শাফেয়ীর মতামত সঠিক। তিনি আভিধানিক ব্যাপারেও ছিলেন বিশেষজ্ঞ। কারণ তিনি শৈশব থেকেই অকৃত্রিম পল্লী পরিবেশে থাকতেন। আর পল্লীর ভাষা ছিল বিশুদ্ধ আরবী—সহজ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে থাকার কারণে তিনি প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বিশুদ্ধ আরবী শেখেন। আলোচ্য বিষয়ে পবিত্র কোরানের শব্দাবলিও তাঁর অভিমতের সমর্থন করে। এছাড়া পূর্বেকার আমলের কোরান বিশেজ্ঞ যায়েদ বিন আসলাম সাহাবী (রা), তাউস এবং জাবের বিন যায়েদের মতো বিখ্যাত তাবেইনদের মতের সাথেও তাঁর মতের সামঞ্জস্য রয়েছে। এছাড়া কর-তবী এবং ফখরুদ্দিন রাযীর মতো কোরান বিষেজ্ঞদের একটি দলও তাঁর বর্ণিত মতের পূর্ণ সমর্থন করেন।

ইমাম বোখারী বলেন যে ইমাম শাফেয়ীর বর্ণিত কোরানী আয়াতের উদ্দেশ্যগত অর্থ এই যে, ব্যক্তি নিজের সন্তান-সন্ততির লালন পালন ও দেখাশুনা করবে, তাদের চাহিদা পূরণ করবে। এখন যে ব্যক্তির পরিবার পরিজন বড় হবে তার ব্যয় ও হবে বেশী এবং তার পক্ষে হালাল ও সম্মানজনক উপায়ে জীবিকা উপার্জন মুশকিল হয়ে পড়ে।

এসব বিশ্লেশন থেকে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসলাম একাধিক বিয়ে করার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। একথা আমাদের ভাল করে মনে রাখতে হবে। আমরা চাই, এই বিষয়ের সব দিক ও বিভাগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক। তাহলে এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষার তাৎপর্য্য খুব ভাল করে প্রকাশ পাবে।

একাধিক স্ত্রীর অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনে

পবিত্র কোরানে প্রয়োজনবোধে চারটি পর্যন্ত বিয়ের অনুমতি দানের সাথে সাথে বিভিন্ন আয়াতে এর জন্যে শর্তও আরোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন যুক্তির মাধ্যমে একাধিক বিয়েকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হচ্ছে—

> "এবং যদি তোমাদের সুবিচার না করতে পারার আশংকা থাকে তাহলে একটি বিয়েই কর।" (আল কোরান)

অন্য এক আয়াতে সতর্ক করে বলা হচ্ছে—

> "(কোন একজনের প্রতি) পুরোপুরি ঝুঁকে যেও না।" (আল কোরান)

বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হচ্ছে—

> "(তোমরা নিজেদের) সব স্ত্রীদের মধ্যে একই রকম সুবিচার করতে পারবে না, তা তোমরা এর যতই ইচ্ছে পোষণ কর না কেন।" (আল কোরান)

উপরে বর্ণিত প্রথম আয়াতের সারমর্ম হচ্ছে "যদি তোমরা কোন একজন স্ত্রীর উপর অত্যাচারের আশংকা কর তাহলে একটার বেশী বিয়ে করো না। কারণ অত্যাচার করা যে হারাম এবং নিষিদ্ধ সে ব্যাপারে প্রত্যেক মুসলমানই মতৈক্য পোষণ করে। আর অত্যাচার এমন এক জঘন্য ব্যাপার যা আল্লাহ নিজেই নিজের উপর এবং তাঁর সব বান্দার উপর হারাম ও নিষিদ্ধ করে রেখেছেন।

এক হাদীসে কুদসীতে স্বয়ং আল্লাহ বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

"হে আমার বান্দারা ! আমরা অত্যাচারকে স্বয়ং নিজের উপর এবং নিজের সব বান্দাদের উপর হারাম করে দিয়েছি। অতএব, তোমরা একে অন্যের উপরে অত্যাচার করোনা।" (হাদীসে কুদসী)

এভাবে কোরান শুরুতেই একাধিক বিয়ের উদ্দেশ্য পোষণ কারীদের সতর্ক করে দেয় যে—দেখ, স্ত্রীদের উপর যেন কোনরকমের যুলুম অত্যাচার না হতে পারে। কারণ যুলুম অত্যাচার আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম ও নিষিদ্ধ। সুতরাং বিয়ের আগেই সব কিছু ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিয়ে করার পরে একথা ভাবলে চলবেনা যে, যদি যুলুম অত্যাচারের আশংকা দেখা যায় তাহলে সংশ্লিষ্টজনকে তালাক দিয়ে দেবো। না—তা চলবেনা। কারণ এতে আরো অধিকতর যুলুমের আশংকা বর্তমান থাকে। এমন ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ে করা সম্পূর্ণ অবৈধ বা নিষিদ্ধ যে নিজের আবেগ-অনুভূতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে অক্ষম।

দ্বিতীয় আয়াতে মানব স্বভাবের দিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কোন এক স্ত্রীর দিকে আন্তরিকতার প্রাধান্য আংশিকভাবে হতেও পারে কিন্তু শুধু এক-জনের দিকে পুরো ধ্যান দিয়ে অন্যান্যদের অবহেলা করা চলবে না। সবাইকে সমানভাবে ভালবাসা সম্ভব না হলেও অধিকার কিন্তু সবাইকে বরাবরই দিতে হবে। ভালবাসার ব্যতিক্রমটা স্বাভাবিক।

তৃতীয় আয়াতে স্পষ্টতই বলে দেয়া হচ্ছে যে 'তোমরা যতই বলনা কেন প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সমতাপূর্ণ সুবিচার করা মুশকিল। অতএব সাবধান ! একটার বেশী বিয়ে করতে গিয়ে অপরিনামদর্শিতার পরিচয় দিওনা।

বলাবাহুল্য, ইসলাম নিছক যৌনবিলাসিতার জন্যে একাধিক বিয়ের অনু-মতি দেয়না। সুতরাং একান্ত অনিবার্য প্রয়োজনের তাগিদেই এই অনুমতি রাখা হয়েছে।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দানের পিছনে মহত্তম উদ্দেশ্য

কোন বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী ব্যক্তির জন্যে একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের পেছনে ইসলামের মহত্তম উদ্দেশ্যটি খুঁজে বের করা মোটেই কঠিন কাজ নয়। একটু চিন্তা করলেই সবাই বুঝতে পারবেন যে ইসলাম একাধিক বিয়ের অনুমতি দানের অবকাশ কেন রেখেছে? আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বাস্তব কারণ তুলে ধরছি।

(ক) মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সন্তান কামনা করে। বিয়ের পর প্রত্যেক পুরুষই পিতা হবার আকাংখাপোষণ করে। কিন্তু বিয়ের পর যদি সে জানতে পারে যে তার স্ত্রী সন্তান উৎপাদনে অক্ষম, তাহলে সে কি সন্তান কামনার স্বাভাবিক স্বপ্ন পরিত্যাগ করবে নাকি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করবে? ইসলাম এক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দেয়। কারণ এই বিপদের সময় ব্যক্তিকে চিরদিনের জন্যে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি না দিয়ে তাকে সন্তান লাভের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে ভারী অন্যায়। সুতরাং স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পুরুষকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতি দিয়ে ইসলাম স্বভাব-সিদ্ধ কর্মপন্থায় গ্রহণ করেছে।

অনেক সময় অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে স্বয়ং প্রথম স্ত্রী স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ে করার জন্যে বাধ্য করে এবং স্ত্রী স্বয়ং তার স্বামীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সতীনের সন্ধানে বের হয় এবং নিজেই বিয়ে ব্যবস্থাবলি গ্রহণ করে। নিজের স্বামীর সন্তান লাভের বাসনা পূরণের জন্যে সে সন্তুষ্টচিত্তে তার ঘরে সতীনকে বরণ করে নেয়।

এটাও দেখা গেছে যে প্রথম স্ত্রী তার সতীনের সন্তানদের নিজ সন্তানের মতোই আদর যত্ন করে লালন পালন করে এবং নিজের শূন্যকোলে সতীনের সন্তান তুলে নিয়ে নারীত্বের পরম তৃপ্তি অনুভব করে। এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, সুতরাং স্বভাবের ধর্ম ইসলাম এই স্বাভাবিকতার পথ রোধ করে দাঁড়াতে পারে?

(খ) খোদা না করুন স্ত্রী যদি এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যার কারণে তার স্ত্রীত্বের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন স্বামী বেচারা কি করবে ?

পাশ্চাত্যের যৌনবিলাসী গোষ্ঠী হয়তো এর জবাবে বলবে যে, বিয়ে করা ছাড়াই সে পরনারীর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, কারণ পাশ্চাত্য বাসীরা ব্যাভিচারকে কোনরকমের অপরাধ বলে মনে করেনা, কিন্তু ইসলাম সৌন্দর্য্য ও শৃংখলাপূর্ণ আদর্শ সমাজকে সুন্দর কাঠামোর উপর গড়ে তোলার জন্যেই এর আগমন ঘটেছে। তাই অবৈধ, লজ্জাকর ও অসম্মান জনক এবং কোনরকমের নোংরামীপূর্ণ কার্যকলাপের অনুমতি দিতে পারে না। সুতরাং যৌন নোংরামী ও ব্যাভিচারের মূলোচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ইসলাম দুরারোগ্য স্ত্রীর স্বামীকে দ্বিতীয় বিয়ের অনুমতিদান করেছে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, আজকাল মুসলমান নামধারী এমন কিছু জ্ঞানপাপী পাশ্চাত্য কুশিক্ষার প্রভাবে পড়ে একান্ত নির্লজ্জভাবে ইসলামের একাধিক বিয়ের অনুমতিদানকে সমালোচনা করে। অথচ তারা তাদের পশ্চিমা প্রভুদের মতো পরনারী ও বেশ্যাদের সাথে কারো যৌন নোংরামীকে অপরাধ তো মনেই করেনা, বরং সবরকমের ব্যাভিচারকে উন্নতি ও প্রগতির লক্ষণ বলে বিবেচনা করে।

যাইহোক, দুরারোগ্য রুগিণীর স্বামীর কাছে এই দুটি পথই খোলা রয়েছে। এখন চাইলে সে ইসলামের অনুমতি মোতাবেক দ্বিতীয় বিয়ে করে সম্মানজনক ও পরিচ্ছন্ন জীবন শুরু করতে পারে—অথবা নোংরামীর পথ বেছে নিতে পারে। এখন সম্মান ও কল্যাণের পথ কোনটি তা তাকে নিজেই বেছে নিতে হবে।

আমাদের মতে সমাজকে অবক্ষয়ের হাত থেকে সুদ্ধ রাখার জন্যে এবং নারী-পুরুষের পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপনের জন্যে বিয়ে থেকে উত্তম আর কোন পন্থা নেই। এজন্যে বে-আক্কেলের মতো না জেনে বুঝে ইসলামের

সমালোচনা না করে বিয়ের উত্তম পন্থা অবলম্বন করাই উচিৎ। কাউকে এত নীচে নেমে যাওয়া উচিৎ নয় যে সে বিয়ে আর বেশ্যালয়ের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতেই অপারগ হয়ে যাবে। কোন কোন লোক মনে করে যে দ্বিতীয় বিয়ে প্রথম স্ত্রীর উপর এক অস্বাভিক বোঝা। কিন্তু যারা একথা বলেন তাঁরা এই প্রশ্নের কি জবাব দেবেন যে, বন্ধ্যা ও দুরারোগ্য রুগিণীর স্ত্রীর স্বামীরা কোন্ স্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করবে ?

(গ) কোন কোন মহিলা এমনও হয়ে থাকে যারা প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের সংস্পর্শ পছন্দ করে না। স্বামী যতই চেষ্টা ও আবেগ প্রকাশ করুক না কেন এধরনের নারীরা কোনক্রমেই যৌন আবেগ অনুভব করেনা। ফলে স্বামী স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। আসলে এটা হচ্ছে এক ধরনের স্ত্রীরোগ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এধরনের স্ত্রীরোগ বেশ পরিলক্ষিত হয়। এখন বলুন-প্রথমা স্ত্রীর মিলন থেকে বঞ্চিত স্বামী যদি এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেটা কি অন্যায় হতে পারে ?

এভাবে আরো অনিবার্য কারণ থাকতে পারে—যেখানে কোন না কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

ইসলাম স্বভাবসম্মত ও বাস্তববাদী জীবনাদর্শ হিসেবে যেখানে পুরো সমাজের সমগ্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দেয় সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যাবলী সমাধানের প্রয়োজনকেও গুরুত্ব দেয় এবং সাধারণ ও বিশেষ উভয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি সমস্যার যথার্থ সমাধান পেশ করে।

বস্তুতঃ ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের স্বার্থকে সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং পরস্পর পরিপূরক মনে করে। এতে কারো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, আমরা প্রত্যেকেই মুসলিম উম্মার সার্বিক উন্নতির জন্যে তার জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য মনে করি। আর এর সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা হচ্ছে বিয়ে। এরই মাধ্যমে যে কোন জাতির উন্নতি ও শক্তি নির্ভরশীল। সুতরাং শক্তি, সম্মান ও উন্নতির এতোবড় প্রভাবশালী মাধ্যমকে কোন মুসলমানই অবহেলার দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

আমরা উদাহরণ স্বরূপ মিশরের উত্তরাঞ্চলের উল্লেখ করতে পারি। ওখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বর। এখানকার আবহাওয়া ও পরিবেশ সবরকমের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত এমনকি এখানে কাজ কর্মের জন্যে বাইরের কোন লোকেরও প্রয়োজন পড়েনা। এখানকার জনবসতি অত্যন্ত ঘন এবং সন্তান প্রজননের হারও বেশী। ক্ষেতখামার এতো বেশী হয় যে কোথাও এক টুকরো খালিজায়গা পড়ে থাকার উপায় নেই। কিন্তু সেখানকার কোন লোক একাধিক স্ত্রী ছাড়া আর্থিক সমৃদ্ধি লাভের চিন্তাই করতে পারে না। একাধিক স্ত্রী যাদের আছে তারা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করে নেয়। অথচ অবিবাহিত অবস্থায় সেখানকার পুরুষরা দরিদ্রকেই নিজেদের কপালের লিখন মনে করতো।—মিশরের উত্তরাঞ্চলে পর্যটনকারী যে কোন ব্যক্তি একথার সত্যতা স্বীকার করেন।

(ঘ) প্রাচীনকাল থেকে আজকের এই দিনটি পর্যন্ত জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধবিগ্রহ চলে আসছে। এই যুদ্ধকালীন অবস্থায় রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্যে এর পেছনে জাতীয় অর্থনীতির গতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে সক্ষম লোকের প্রয়োজন যে কতো বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

এ ব্যাপারে এটা উল্লেখযোগ্য যে, একাধিক বিয়ের কারণে প্রথম যুগের মুসলমানরা বিস্ময়কর উন্নতি অর্জন করেছিলেন। তাদের জনশক্তি সুসংগঠিত ছিল বলে একদিকে তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেন এবং অপরদিকে শত্রুর হামলার মোকাবেলা করে শত্রুকে পরাজিত করেন। দেশের পর দেশ তাঁদের পতাকাতলে সামিল হয়ে যায়। সে যুগে কক্ষনো কোনক্ষেত্রে সক্ষম লোকের অভাব দেখা যায়নি। তখন মুসলমানদের জনসংখ্যা ছিল যেমন পর্যাপ্ত তেমনি তারা সবাই ছিল সংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

আমাদের এই আধুনিক যুগে জার্মানীর দৃষ্টান্ত সামনে রাখা যেতে পারে যখন একের পর এক যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে যুবকদের বিরাট একটি অংশ নিহত হলে হিটলারের টনক নড়ে উঠে। হিটলার তখন এটা চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে—যুদ্ধে যে বিপুল লোক মারা গেছে তাতে জার্মানীর জাতীয়

অস্তিত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন, আর এই সমস্যার একমাত্র প্রতিকার হিসেবে জার্মান জাতি একাধিক বিয়ের পদ্ধতি গ্রহণ করে। উনিশ'শো ষাটের তেরই ডিসেম্বরে দৈনিক আল-আহরামে হিটলারের উপ-প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুরমানের ১৯৪৪ সালে লিখিত একটি প্রামাণ্য পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে জার্মান উপ-প্রধানমন্ত্রী লিখেন যে, হিটলার অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ভাবছিলেন যে, "জার্মান জাতির ভবিষ্যত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জার্মানীর প্রতিটি পুরুষকে আইনগতভাবে দুটি বিয়ে করার জন্যে বাধ্য করা জরুরী।"

এ ছাড়া আরো একটি বাস্তবতা হচ্ছে এই যে মহিলাদের তুলনায় যদি পুরুষের সংখ্যা কমে যায় তাহলে এক সাংঘাতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। সমাজে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের সংখ্যা বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলে তখন একজন পুরুষ যদি কেবল একটি মাত্র বিয়ে করে তাহলে অন্যান্য অবশিষ্ট বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কি অবস্থা দাঁড়াবে? বলাবাহুল্য সমাজ যদি তাদের স্বাভাবিক দাবী পূরণের বৈধ পথ না ছেড়ে দেয় তাহলে তারা বিপথগামী হতে বাধ্য হবে। যুবতী মেয়েরা শুধু খেয়ে পরেই তো সন্তুষ্ট থাকতে পারে না, তাদের স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা পূরণেও জরুরী।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিরোধীরাও এসব বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল রয়েছেন। তাঁরা এটাও জানেন যে, বিয়ে ও একাধিক বিয়ের স্বাভাবিক পথ বন্ধ থাকার কারণে পাশ্চাত্য সমাজে যৌন নোংরামীর ঢল নেমেছে। আজ গোটা পাশ্চাত্য সমাজ যৌন অপরাধ প্রবণতার খোলাবাজারে পরিণত হয়ে রয়েছে। কিন্তু এই বাস্তব অবস্থা জানা সত্বেও কতিপয় বর্ণচোরা লোক বৈধ ভাবে একাধিক বিয়ে করাকে অবৈধভাবে ব্যাভিচারে লিপ্ত হবার চেয়েও মারাত্মক পাপ বলে মনে করে। এদের কাছে পাপটাই প্রশংসনীয় আর ন্যায়টা নিন্দনীয়। এসব লোক বৈধ উপায়ে সন্তান উৎপাদনে নাক সিটকায় আর অবৈধ জারজ সন্তানদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার দাবী করে। যেন বৈধ পিতার সন্তানরা অবৈধ জারজ সন্তানের চেয়ে হীন কিছু। তথাকথিত আধুনিকাদের এসব হাস্যকর আন্দোলনগুলোর পরিণাম যে কি হবে তা খুবই

পরিষ্কার বুঝা যেতে পারে। এরা পাশ্চাত্যের মতো আমাদের সমাজকেও আবর্জনাপূর্ণ করে দিতে সচেষ্ট।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীর মহিলারা ব্যাভিচার (যেনা) কে আইনগত মর্যাদা দেবার দাবী তোলে এবং সারাজীবন নির্দিষ্ট কোন বেশ্যালয়ে কাটাতে এবং সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত শিশুর মা হতে অস্বীকার করে। তারা দাবী করে যে তাদেরকে সাময়িকভাবে একেকবারে এক একজন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েমের অধিকার দেবে এবং এক মহিলা যে পুরুষকে ছাড়বে অন্য মহিলা এসে তার স্থান পূরণ করবে। তারা তাদের এই দাবী পূরণের জন্যে একটি আন্দোলন গড়ে তোলে যাতে তাদের আওয়াজকে সর্বত্র পৌঁছানো যায় এবং ব্যাভিচারের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাদের এই হাস্যকর ও অবাস্তব দাবী ইউরোপে যেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু গোটা পাশ্চাত্যে একদিকে বৈধ পন্থায় একাধিক বিয়েকে কঠোর সমালোচনা করে আর অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে একই পুরুষকে কয়েকটি নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে আপত্তিকর কিছু মনে করে না। বলাবাহুল্য পাশ্চাত্যের পুরুষদের মতো নারীরাও অবৈধভাবে বিভিন্ন পুরুষের সাথে যৌনসম্পর্ক রক্ষাকে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার বলে মনে করে।

উপসংহার

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের আইনগত অনুমতি আসলে আপত্তিকর কিছু নয়। বরং তার অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগটাই আপত্তিকর যা ভোগবাদী মানুষ নিছক যৌন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে করে। বস্তুবাদী ও ভোগবাদী পাশ্চাত্য সমাজে খাওয়া পরা আর ফুর্তি করাটাই হলো আসল কথা। সেখানে বিয়ের স্বাভাবিক ব্যবস্থা অবহেলিত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ব্যাভিচারী বলে সেখানে তালাকের হিড়িক লেগে রয়েছে। সেখানে যৌন সম্ভোগটাই বিয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাদের ব্যাভিচার ও যৌন নোংরামীর ফলে সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে তা ভেবে দেখার

অবকাশ তাদের নেই। মোট কথা যৌন স্বার্থ ছাড়া পাশ্চাত্য সমাজে মেয়ে ও মহিলাদের অন্য কোনরকম মর্যাদা বা গুরুত্ব নেই।

এই পাপাচারের অবসান ও সমাজের সংস্কার কেবল আল্লাহ নির্দেশিত স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেই করা যেতে পারে। এজন্যে আল্লার দেয়া জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা একান্তই অপরিহার্য্য। ইসলামী শিক্ষার আলোকে মানুষের মনমস্তিষ্ক ও চিন্তাভাবনার পরিশুদ্ধি করতে হবে। লোকদের ইসলামী আদর্শের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। এরপরই এসব নোংরামীর উচ্ছেদ সহজ-সম্ভব হবে।

আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আগেকার যুগের তুলনায় একাধিক বিয়ের প্রচলন আজকাল অনেক কমে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে মানুষ আজ তার দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন এবং জীবনের উন্নতি সম্পর্কে ভাল করে অবহিত। এমন অনেক লোকও রয়েছেন যাঁরা ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির জ্ঞান অর্জন করে নিজেদের মনমগজ ও ক্ষমতাকে মহত্তম উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে উৎসর্গ করে রেখেছেন।

এই যে বিশ্বজোড়া নতুন ইসলামী জাগরণ এবং জ্ঞানী বুদ্ধিমান ও আলোক প্রাপ্ত লোকদের মধ্যে যে ব্যাপক ইসলামী অনুভূতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। এতে করে এটাও আশা করা যায় যে, কেউ আর বিনা কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করবেনা এবং অদূর ভবিষ্যতে কেবল অনিবার্য্য কারণবশতঃই তারা একাধিক বিয়ের অনুমতি থেকে উপকৃত হবে। এভাবে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব সুফল সর্বত্র দেখা যাবে এবং দুনিয়ার অন্যান্য ধর্ম ও মতাবলম্বীদের উপরও ইসলামের ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। প্রত্যেকের সামনেই ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণিত হয়ে যাবে।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তালাক

"আল্লার কাছে হালাল বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয় হচ্ছে তালাক।"

(আবুদাউদ-ইবনে মাজা-হাকেম)

ইসলাম তালাককে অপসন্দ করে

তালাকের সহজ সরল অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তারা আল্লার আইন মোতাবেক পরস্পর যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা নাকচ করে দেয়া।

মানুষের পক্ষ থেকে আল্লার আইন নাকচ করার অর্থ হচ্ছে আল্লার মধ্যস্থতাকে ভঙ্গ করা। যারা এমন করে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালবাসা ও স্বস্তির অবসান ঘটায়। কোন রকম অনিবার্য্য ও অপরিহার্য্য কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা আল্লার আইনের সাথে ঠাট্টা বিদ্রূপ করার সমতুল্য ধৃষ্টতা। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নবী (স) বলেছেন—

"তোমাদের কি হয়েছে? তোমরা আল্লার (নির্দ্ধারিত) সীমার সাথে খেলা করছ, কখনো বল যে তালাক দিয়েছি, আবার কখনো (তা) ফিরিয়ে নাও।"

(ইবনে মাজা-ইবনে হিব্বান)

"আল্লার কিতাবের সাথে কি খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।" (নেসায়ী)

এসব কথা প্রিয়নবী (স) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন যে, তার স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক দিয়েছিল।

আজকাল সাধারণভাবে লোক যেমন মনে করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক দেয়া এতো সহজ ব্যাপার নয়। এটা একটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। ইসলামী শরীয়ত একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়েছে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের চরম অবনতিশীল অবস্থায়—যখন মিলেমিশে দাম্পত্য জীবনযাপনের অন্য কোন বিকল্প পন্থাই অবশিষ্ট না থাকে—ঠিক তখনই স্বামীকে এই শেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। তালাকের প্রতি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়নবী (স) বলেন—

> "আল্লার কাছে হালাল বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে তালাক।" (আবুদাউদ-ইবনেমাজা-হাফেষ)

প্রিয়নবী (স) আরো বলেন—

> "আল্লাহ্ তালাকের চেয়ে বেশী নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই সৃষ্টি করেন নি।" (দারকুত্নী)

হযরত আলী (রা) প্রিয়নবী (স)-র বরাত দিয়ে বলেন—

> "বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক এমন জিনিষ যার কারণে আরশও নড়ে উঠে।" (দায়লামী)

তালাক ও যৌন বিলাসিতা

কোন কোন লোক জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে চরম উদাসীন হয়ে থাকে। জীবনের সব ব্যাপারেই তাদের দৃষ্টিকোণ হয় ভাসা ভাসা। জীবন ও তার বাস্তবতাকে গভীরতার সাথে বিবেচনা করতে তারা অক্ষমতার পরিচয় দেয়। যেমন এ ধরণের লোকেরা বিয়েকে নিছক যৌন বিলাসিতারই একটা মাধ্যম মনে করে। ব্যস, যখনি কোন নারীর উপর তাদের আবেগ উত্তেজনায় ভাটা পড়ে যায়, তখন তারা তাদের যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্যে অন্য নারীর অনুসন্ধান করে। কিছু দিন পর যখন এটার উপরও তাদের বিরক্তি এসে পড়ে তখন তারা আরেক জনের দিকে দৃষ্টি হানে। এভাবে তাদের যৌন বিলাসিতার

ঘৃণ্য অভিযান অব্যাহত থাকে। তারা তাদের পাশবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে অসংখ্য নারীর জীবন ও মর্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তাদের এই জঘন্য যৌন বিকৃতির শিকারে পরিণত হয়ে যে কতো অসংখ্য নারীর জীবন ব্যর্থ ও বিনষ্ট হচ্ছে, তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক তাকে বিবেচনা যোগ্য মনে করে না। এ ধরণের লোকদের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

"বিয়ে কর কিন্তু তালাক দিও না, কেননা আল্লাহ্ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের ভালবাসেন না।"

(দায়লামী ও দারকুতনী)

আমরা আগেই বলেছি যে, পাশ্চাত্য সমাজের যৌন বেলাল্লাপনা ও ব্যাভিচার একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এখন তারা তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সেই বিভৎস দিকটির প্রকাশ্য প্রচারনাকেও আর লজ্জাকর বা অপমানজনক মনে করে না। এমন কি পাশ্চত্যের নারী পুরুষ বিয়ের পরেও অন্যান্যদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে আপত্তিকর মনে করে না, বরং তারা বিজ্ঞ দার্শনিকের মতো অবাধ যৌন মিলনকে একটা স্বাভাবিক প্রয়োজন বলে যুক্তি দেয়। এভাবে পাশ্চাত্যের যে কোন স্বামী বিয়ের পরও বিভিন্ন পর নারীর সাথে প্রকাশ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের স্ত্রীরাও স্বামী থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন পর পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক কায়েম করে। এবং এটাকেই তারা "আধুনিকতা" এবং "প্রগতিশীলতা" বলে মনে করে। আমাদের মতে এটা হচ্ছে মানবতার অবনতির সবচেয়ে নিকৃষ্টতম অবদান। পাশ্চাত্যের এই তথাকথিত ঘৃণ্য আধুনিকতা ও জঘন্য প্রগতিশীলতা মানুষের জ্ঞান বিবেক সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে সবরকমের মানবিক গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে নারীও মানুষ—পুরুষও মানুষ এবং একজন মানুষের সব চেয়ে বড়গুণ ও মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার মানবিকতা আর মানবিকতার অর্থ হচ্ছে উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এথেকে বড় সম্মান ও বড় সম্পদ মানুষের আর কিছুই হতে পারে না, এথেকে সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য আর কিছুতেই নেই। বিশেষ করে আত্মসম্মান ও লজ্জাশীলতা হচ্ছে নারীর সবচেয়ে বড় সম্পদ, আর এটাই তার প্রধান রূপ ও গুণ। যদি এই গুণ বৈশিষ্ট্য থেকে

নারী বঞ্চিত হয়ে পড়ে তাহলে সে এক জঘন্যতম প্রাণীতে পরিণত হয়। আত্মমর্যাদাবোধহীন এবং নির্লজ্জ নারী হচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে নিকৃষ্টতম—নীচ—নারী।

তালাক ও মতপার্থক্য

হতে পারে, কোন কোন নারীর মধ্যে কিছু অপসন্দনীয় অভ্যাস পাওয়া যেতে পারে—যার কারণে সে নিন্দনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় তালাক নয়। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক ছোটখাট খুঁত গুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের মধ্যেকার মিলগুলো নিয়ে সুখী-সুন্দর ও স্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করুক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে বিশেষ রেয়াত (ছাড়) দেয়ার পরামর্শ দেয় এবং নারীর ছোটখাট ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করার সুপারিশ করে। প্রিয়নবী (স) তুলনামূলক উদাহারণের মাধ্যমে নারীর পক্ষ সমর্থন করে বলেছেন—

> "নারী পাঁজরের মতো বাঁকা, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও! তাহলে সে ভেঙ্গে যাবে। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তাদের বাঁকাপনা সত্ত্বেও তোমরা তাথেকে উপকৃত হতে পারবে।" (বোখারী ও মুসলিম)

হাদীস শরীফের শেষ অংশটির ব্যাপারে ভাবলেই বুঝতে পারবেন যে, পুরুষকে নারীর ছোটখাট দোষ ত্রুটির দিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে এবং ক্ষমাই যে মহৎ ও সুখী জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন তার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। এটাও বলে দেয়া হচ্ছে, যে তোমরা যদি ক্ষমা ও মহত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীদের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাক তাহলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত-বিষাক্ত হয়ে পড়বে।

কিন্তু তাই বলে কেউ যেন এটা মনে না করেন যে ইসলাম নারীকে ইচ্ছা কৃত-ভাবে অপরাধ করার বা চরিত্র বিরোধী ব্যবহারের সুযোগ করে দিচ্ছে অথবা নারীকে আপদ মস্তক অপরাধিনী মনে করছে। না তা নয়। আসলে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে এটা বুঝানো যে—ঘটনাচক্রে নারীর মধ্যে

যদি কোন দোষ দেখা দেয় তাহলে তাকে পৃথক করে দেয়ার ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া না করা হয়। কারণ, হতে পারে—একদিকে তার কোন খুঁত থাকলেও অপর কোন দিক হয়তো। অনেক ভাল গুণও থাকতে পারে—যা তোমাদের পসন্দনীয়। কারণ দোষগুণ নিয়েই মানুষ, আর নারী মানুষ বৈতো নয়। এই বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়নবী (স) বলছেন—

> "কোন মোমেন পুরুষ যেন কোন মোমেনা নারীকে ঘৃণা না করে। কেন না, হতে পারে তার কোন কর্ম অপসন্দ তাহলে অন্য কর্ম পসন্দ ও হতে পারে।" (আহমদ, মুসলিম)

এই হাদিস থেকেও অনুমান করা যায় যে ইসলাম কিভাবে মুসলমানদেরকে তালাকের নিন্দনীয় পন্থা থেকে বিরত রাখতে চায়। যদি স্ত্রীর কোন দোষত্রুটি থেকেই থাকে তাহলেও পুরুষকে সমঝোতা ও সম্প্রীতির পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। ইসলাম এ ব্যাপারে পুরুষকে কেবল পরামর্শই দেয়না বরং স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করার আদেশই দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেছেন—

> "ওদের (স্ত্রীদের) সাথে সদয় সুন্দর ব্যবহার কর। যদি তারা তোমাদের অপছন্দও হয় তাহলে হতে পারে যে তোমরা কোন একটা জিনিষকে অপছন্দ করবে আর আল্লাহ তার মধ্যেই অনেক কল্যাণ নিহিত রাখবেন।" (নিসা ১৯)

এই আয়াতে তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আবুবকর জাস্সাস তাঁর তাফসীর আহা'কামুল কোরানে বলেন 'এই আয়াত এ কথার প্রমাণ যে ইসলামী শরীয়ত' স্বামী অপসন্দ সত্বেও স্ত্রীকে টিকিয়ে রাখার উপদেশ দেয় কেন না অল্লাহতালা এর মাধ্যমে আমাদেরকে এই শিক্ষা দিচ্ছেন যে তাতে তিনি বিরাট কল্যাণ রেখেছেন।

কিন্তু এতোসব সত্বেও স্ত্রী যদি সত্যিসত্যিই কোন অপ্রিয় কর্মে অভ্যস্ত হয়ে থাকে সামাজিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে এবং স্বামীর শান্তি স্বস্তি নষ্ট করছে, এবং যদি কোন আলাপ-আলচনা ও শলা পরামর্শও ব্যর্থ প্রমানিত হয়

প্রীতিভালবাসা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরও যদি স্ত্রী তার ক্ষতির বদআভ্যাস ত্যাগ না করে থাকে তাহলে ইসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বামী স্ত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে দাম্পত্যসম্পর্ক পৃথকীকরণের অনুমতি দেয়। কিন্তু শেষ পর্যায়েও প্রিয়নবী (স) সতর্ক উপদেশ দিয়ে বলেন যে,

> "নারীদেরকে কোন যুক্তি সঙ্গত কারন ছাড়া তালাক দিওনা, কেননা আল্লাহ সম্ভোগকারী এবং সম্ভোগকারীনীদের ভালবাসেন না।
>
> (তাবরানী)

আভিধানীক ও পারিভাষিকভাবে হাদিসটির সারমর্ম হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান ততক্ষণ পর্যন্ত নারীদের তালাক দিওনা। বস্তুতঃ তালাক হবে একান্ত অন্যন্যোপায় অবস্থার শেষ ব্যবস্থা।

যেসব কারণে তালাক অকার্য্যকরী হয়ে যাবে

পবিত্র কোরান ও হাদিসের শিক্ষা মোতাবেক যেসব কারণ ও অবস্থায় তালাক কার্য্যকরী হবে না, ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ ও গবেষকরা তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

(১)—তীব্র ক্রোধের অবস্থায় দেয়া তালাক কার্য্যকরী হবে না। তীব্র ক্রোধের অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির সেই অবস্থা যখন সাময়িক উত্তেজনায় তার হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং যা সে বলতে চায় তা বলতে পারে না, এবং তার মুখ থেকে ওসব কথা বেরিয়ে আসে, যা বলার কোন উদ্দেশ্যই তার মনে ছিলনা। ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞরা নিম্নের হাদিস থেকে এই যুক্তি প্রমান গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয়নবী (স) বলেছেন—

> "ক্রোধের অবস্থায় তালাকও কার্য্যকরী হয় না আর যুক্তিও নয়।"

মূল হাদিসে আরবী "এখলাক" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, মনীষী ইবনে কাইউম 'এখলাক' এর অর্থ করেছেন 'গযব' বা ক্রোধ বলে। ইমাম আবু দাউদও তাঁর 'সুনান'-এ একই অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে গবেষণামূলক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—"গলক" সে ধরনের লোকদের বলা হয় যাদের চিন্তা ও বোধশক্তি লোপ পায়, যেমন মদখোর, পাগল এবং অত্যাধিক উৎপীড়িত

ব্যাক্তি বা ভীষণ রোগে আক্রান্ত কোন লোক। এসব ধরনের অবস্থায় তালাকদাতার মনে তালাকের কোন উদ্দেশ্য থাকে না। এজন্যে যদি জেনেবুঝে তালাক না দেওয়া হয় তাহলে এসব অবস্থায় তালাক কার্যকরী হবে না।''

(২)—যদি কোন ব্যাক্তি এভাবে বলে যে, ''যদি আমি অমুক কর্ম করি বা না করি তাহলে আমার উপর তালাক জরুরী''। তা এধরনের কথায়ও তালাক কার্যকর হবে না। মনীষী ইবনে কাইউম তাঁর ''এলামুল মোকেয়ীন'' গ্রন্থে লিখেছেন—''ইমাম আবু হানীফা'' (র) এবং তার দল ভুক্ত কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতামতও তাই। ''আমার উপর তালাক জরুরী হবে''—এই কথা বলার ব্যাপারে তাদের অভিমতও একই। এর কারন আসলে এই যে এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণকারী ব্যাক্তি আসলে ভবিষ্যাতের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে, অথচ তালাক কেবল তখনই কার্যকরী হয় যখন কোন ব্যাক্তি সুস্থ ও স্বজ্ঞানে বর্তমান অবস্থায় উদ্দেশ্য সহকারে (তালাক) দেয়। যদি এসব শর্ত পাওয়া না যায় তাহলে তালাক কর্যকরী হবে না''। ইবনে কাইউম বলেন—'এধরনের বক্তব্য প্রকাশকারী যেন এই কথাই বলতে চায় যে—''তোমাকে তালাক দেয়া আমার উপর জরুরী হবে'' আর একথা সর্বজনসম্মত যে, যদি সে ব্যাক্তি এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয় তাহলেও তালাক কার্যকরী হয় না।''

(৩)—যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, ''যদি তুমি অমুকের সাথে কথাবার্তা বল অথবা আমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে বের হও তাহলে তোমাকে তালাক।'' এখন এরপর যদি সেই স্ত্রী কারো সাথে কথাবার্তা বলে বা স্বমীর বিনা অনুমতিতে ঘর থেকে বের হয় তাহলে তালাক কার্যকরী হবেনা। ইবনে কাইউম ইমাম শাফেয়ী মতের অনুসারী বিভিন্ন ইমামের বক্তব্যের উল্লেখ করে এ সম্পর্কে নিজের অভিমত প্রকাশ প্রসঙ্গে বলেন—''এই বক্তব্য আদলে ফিকাহ পর্যায়ের'' ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদের 'উসুলে ফিকাহ'র এর সমর্থন রয়েছে। এরপর

৯ —

তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে এটা প্রমাণ করেছেন যে ইমাম মালেকও ইমাম আহমদের উসূলে ফিকাহ্ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।

(৪)—যে ব্যক্তি তালাকের মাধ্যমে কসম করে তার কসম লঘু মনে করা হবে। অথবা যদি কেউ কসম করে এবং সে কসম ভঙ্গ করে তাহলে তার তালাকও কার্যকরী হবে না। ইবনে কাইউম 'এলামুল মোকেয়ীন' গ্রন্থে লিখেছেন—

"এটা পূর্বসূরীদের পসন্দনীয় অভিমত—যাকে হযরত আলী (রা) এর মতো মহান সাহাবীও সমর্থন করেছেন। আর কোন কোন মালেকী ফকীহ ও পর্যালোচকের অভিমত তো এই যে এ ব্যাপারে সাহাবীদের মধ্যে কোন মত-ভেদ ছিল বলেও উল্লেখ নেই। এ শব্দসমষ্টি হচ্ছে আবুল কাশেম আল্-ই-য়েমেনীর যা "আহকামে আবদুল হকে" উল্লেখ রয়েছে। আর এর আগে আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজম এর অভিমতও অনুরূপ ছিল—যার সমর্থন তাউ-সের মতো মহান তাবেঈ এবং ইবনে আব্বাসের কোন কোন বিশ্বস্ত সাথীরাও করেছেন।"

আল্লামা আবদুর রাজ্জাক তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—"আমাদেরকে জানিয়েছেন ইবনে জরীহ্; তিনি বলেন, "আমাদেরকে অবহিত করে-ছেন তাউস তাঁর পিতার মধ্যস্থতায়; তিনি বলে থাকতেন যে, তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়ার কোন অর্থ হয় না।" উল্লেখযোগ্য যে এই অভিমত প্রকাশ করছেন এমন এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি—যিনি তাবেঈনদের মধ্যে অন্যতম মহান তাবেঈ বলে বিবেচিত হন। আর তাঁর সমর্থনে রয়েছেন চারশোরও বেশী ইসলামী বিশেষজ্ঞ এবং এরা সবাই কোরান ও সুন্নাহর বিশেষজ্ঞ হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকেন। তাঁদেরই ধারাবাহিকতায় শেষ স্তম্ভগুলোর মধ্যে আল্লামা আবু মোহাম্মদ ইবনে হাজমের মতো মনীষীরা রয়েছেন।

কোন কোন ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ এই ধারণাও পোষণ করেন যে তালাকের মাধ্যমে কসম খাওয়া একেবারে লঘুর পর্যায়ে পড়ে না। এর শরী-য়তী মান হয়ে যায় এবং কসম ভঙ্গকারীকে কাফ্ফারা আদায় করতে হয়।

আর কাফ্ফারা ওটাই হবে যা কোরানের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে—

"(কসম ভাঙ্গার) কাফ্ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাবার পরিবেশন করবে যা তোমরা নিজেদের সন্তান সন্ততিকে খাইয়ে থাক, অথবা তাদেরকে বস্ত্র পরাও, অথবা একজন গোলাম মুক্ত করাও। আর যারা এসবের ক্ষমতা রাখেনা তারা তিনদিনের রোযা রাখবে।" (মায়েদা-৮৯)

কিন্তু এতে করে তালাক কার্যকরী হবে না। কারণ কাফফারা এবং তালাকের কার্যকরীতার মধ্যে কোনরকমের সম্পর্ক নেই। যদি কাফফারা আদায় না করে তাহলে গুনাহর ভাগী হবে আর আদায় করে দেয় তাহলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

উপরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে সামনে রেখে দেখুন যে, ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে কতো মজবুত ও স্থিতিশীল করে দিয়েছে। এই সম্পর্ক কোন পাগলের প্রলাপ অথবা ক্রোধগ্রস্থের ক্রোধ ছিন্ন করতে পারে না। বলাবাহুল্য, ইসলাম নারীকে তার সন্তানসন্ততি এবং স্বামীর সাথে শান্তিতে থাকার এক সম্মানজনক সুযোগ সরবরাহ করে। আর এই সম্পর্ক ততক্ষণ পর্যন্ত অটুট থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ের সামাজিক জীবনে তিক্ততার সৃষ্টি না হয়।

তালাকের নিয়ম-নীতি

ইসলাম জটিল সমস্যাবলীকে বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের সাথে সমাধান করার শিক্ষা দেয়। মানুষ যদি ইসলামের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করে এবং তার শিক্ষা মেনে চলে তাহলে তালাকের দুর্ঘটনা কম হয়ে যাবে এবং বিয়ে একটি অটুট ও স্থায়ী বন্ধনে পরিণত হবে।

মতভেদের সূত্রপাত স্বামীর পক্ষ থেকে হয় অথবা স্ত্রীর পক্ষ থেকে অথবা এর মধ্যে উভয়েরই কিছু না কিছু হাত থাকে। যদি সূত্রপাত স্ত্রীর দিক থেকে হয় এবং স্বামী তাকে চাপানোর চেষ্টা করে থাকে, তাহলে এমন স্ত্রীকে কোরানী পরিভাষায় 'নাসেজ' অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে আর যদি স্বামীই সূত্রপাত করে থাকে আর স্ত্রী তাকে চাপানোর চেষ্টা করে থাকে—

তাহলে স্বামীকেই "নাসেজ" অর্থাৎ অবাধ্য বলা হবে। কিন্তু মতভেদে যদি উভয়ের হাত বরাবর থাকে তাহলে উভয়কে কোরানী পরিভাষা মোতাবেক "শেকাক" বলা হবে। ইসলাম এই তিনটি সমস্যারই সমাধান পেশ করেছে। এবং কল্যাণকামী আপোষ মীমাংসাকারী হিসেবে অত্যন্ত উন্নত পর্যায়ের জ্ঞানবুদ্ধি ও বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে এসব সমস্যার সন্তোষজনক প্রতিকার বিধান করে। নীচে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করবো।

স্ত্রীর অবাধ্যতা

"নসুজ" এমন অবস্থাকে বলা হয় যখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন একজন অন্যজনের প্রতি অবাধ্যতা ও ঘৃণা প্রদর্শন করে আর স্ত্রীর "নাসেজ" বা অবাধ্য হবার অর্থ হচ্ছে সে স্বামীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে এবং তার অধিকারকে উপেক্ষা করতে শুরু করে। পবিত্র কোরানে এই সমস্যার নিম্নলিখিত সমাধান পেশ করেছে—

(১) স্বামী তার স্ত্রীকে প্রীতি ভালবাসার মাধ্যমে উপদেশ দেবে এবং সহানুভূতির দৃষ্টিকোণ থেকে তার ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দেবে। তাকে এটা বলবে যে তার এই অবাধ্যতা আল্লার দরবারে অপসন্দনীয় হবে এবং এর পরিণামও ভাল হয় না। এভাবে স্বামী উদাহরণের মাধ্যমে আদর্শ স্ত্রীদের পন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেবে।

এধরনের অবস্থায় স্বামীকে অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে হবে। উপযুক্ত সময় ও অবস্থা মোতাবেক উপদেশ দেবে। এমন সময় ও অবস্থায় স্ত্রীকে উপদেশ দেবে যখন তা গ্রহণের জন্যে স্ত্রী মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে। এভাবে হতে পারে স্ত্রী তার কথায় প্রভাবান্বিত হবে এবং পরিবার এক অবাঞ্ছিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(২) স্বামী যদি উপদেশ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে পড়ে এবং বিছুতেই স্ত্রীকে পথে তোলা সম্ভব না হয় তাহলে ইসলাম এক্ষেত্রে শাস্তির পরামর্শ দেয়। আর শাস্তি এভাবে হবে যে, প্রথমে স্বামী পৃথক কক্ষে শয়ন করবে এবং পৃথক বিছানায় শোবে এবং স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করবে—তার কাছে

যাওয়া বন্ধ করবে এবং তার চলাফেরায় এটা দেখাবে যে সে তার উপর ভীষণভাবে অভিমান করে আছে। এতে করে স্ত্রীর নারীসুলভ অহংকারে আঘাত লাগবে এবং এভাবে সে অবাধ্যতার পথ ত্যাগ করতে পারে। কারণ নারী সবকিছু সহ্য করতে পারে কিন্তু তার নারীত্বের অবমাননা কখনো সহ্য করতে পারে না। একবার যদি সে তার অমর্যাদা বুঝে নিতে পারে তাহলে অবাধ্যতার পথে অবিচল থাকা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৩) স্বামী যদি এভাবে নিজের উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে তো ভালোই। যদি সে পন্থাও ব্যর্থ প্রমাণিত হয় তাহলে একটু তিরস্কারের সাথে হালকা মারধোর করবে কিন্তু এমন ভাবে মারা চলবে না যাতে তার শরীরে দাগ পড়ে, আসলে হালকা মারধোরটা হবে ক্ষনিকের জন্যে কষ্টদায়ক।

এ হচ্ছে, স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে স্বামীকে দেয়া কয়েকটি কার্যকরী পদ্ধতি। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তাড়াহুড়া বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না বরং ধর্যের সাথে ফলাফলের অপেক্ষা করতে হবে। যদি উল্লেখিত কোন এক পন্থায় স্ত্রী অবাধ্যতা পরিত্যাগ করে তাহলে স্ত্রীকে আগের মতো প্রেমপ্রীতি ও ভালবাসা দেবে এবং তার সাথে পূর্ণ দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করবে।

কিন্তু যদি অবস্থা তার উল্টো হয় তাহলে উভয়ের পৃথক হয়ে যাওয়াই উত্তম। উল্লেখযোগ্য যে আমাদের এতক্ষনের আলোচনা কোরানের এই আয়াতের উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। আল্লাহ বলেছেন—

> "এবং যেসব নারী থেকে তোমরা অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে বুঝাও, শয়নকক্ষে তাদের কাছ থেকে আলাদা থাক এবং মারধোর কর যদি তারা তোমাদের বাধ্য হয়ে যায় তাহলে অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা খুঁজোনা। বিশ্বাস রেখো, উপরে আল্লাহ রয়েছেন, তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।" (নিসা-৩৪)

এখানে একটি বিষয় যা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করে তাহলো এমন অবস্থায়ও ইসলাম আকার-ইঙ্গিতেও তালাকের কথা উল্লেখ করে নাই বরং স্বামীকে আদেশ দেয়া হচ্ছে সে যেন জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার সাথে স্ত্রীকে বুঝিয়ে সমস্যাটি সমাধানে যেন আন্তরিক চেষ্টা করে। এর জন্যে আলাদা শয়ন, অভিমান প্রকাশ এবং একান্ত দরকার দেখা দিলে খুব হালকা মার-ধোর করারও পরামর্শ দেয়। কিন্তু এতদসত্বেও তালাকের মতো চরম-পন্থা অবলম্বনের কথা বলে না বরং স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলে যে, "অনর্থক তাদেরকে মারপিট করার বাহানা খুঁজোনা।" এথেকে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট হয়ে যায়।

খোলয়া

এমন মার যার আঘাতে দাগ না পড়ে। এই হচ্ছে সেই শেষ ধাপ যেখানে এসে স্বামীর প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায়। এরপর স্ত্রীর অবাধ্যতার প্রতিকার করার কোন পন্থাই আর স্বামীর কাছে থাকে না। এখানে এসে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এরপর ইসলামের উপদেশ ও শিক্ষা কি? বলা বাহুল্য এর পরেও তালাকের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে না। এখন স্ত্রী যদি সত্যি সত্যিই নিয়-ন্ত্রনের বাইরে চলে গিয়ে থাকে এবং কোনরকমেই স্বামীর দাম্পত্য অধিকার পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাহলে তখন ইসলাম স্ত্রীকে এই অধিকার দেয় যে, সে তার স্বামীর কাছে পৃথক হয়ে যাবার দাবী করবে এবং এর পরিণামের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে স্বামী স্ত্রীর পেছনে এত টাকা-পয়সা ব্যয় করছে এবং তার ব্যয়ভার নির্বাহ করেছে সে এত সহজে কিভাবে স্ত্রীকে ছেড়ে দেবে? সুতরাং সুবিচারের দাবী হচ্ছে স্ত্রী মোহর হিসেবে স্বামীর কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছে তা ফিরিয়ে দেবে।

তবে স্ত্রী কি পরিমাণ অর্থ আদায় করে খোলয়া অর্জন করবে সে ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন—খোলয়ার পরিমাণ মোহরের বরাবর হবে এবং কেউ কেউ এর চেয়েও বেশী গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছেন।

খোল্‌য়ার যুক্তি

নিম্নবর্ণিত কোরানী আয়াত থেকে খোল্‌য়ার যুক্তিপ্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন—

> "তোমাদের জন্যে হালাল নয় যা কিছু তোমরা স্ত্রীদের দিয়েছ তাথেকে কিছুমাত্রও ফেরৎ নেয়া, অবশ্য এই যে স্বামী-স্ত্রী (যদি) এই আশংকা করে যে আল্লার সীমায় কায়েম থাকতে পারবে না তখন এমন অবস্থায় যখন তুমি ভয় কর যে, স্বামী-স্ত্রী আল্লার সীমায় কায়েম থাকতে পারবেনা তখন কোন বাধা নেই যদি নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেয়।"
>
> (বাকারা—২২৯)

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ (স) এর দরবারে খোল্‌য়ার সর্বপ্রথম মামলা দায়ের করা হয় জামীলা বিনতে সালুলের পক্ষ থেকে। তিনি তাঁর স্বামী সাবেত ইবনে কায়েসকে কিছু লোকের সাথে যখন ত্রাসতে দেখেন তখন তাঁকে অত্যন্ত কুৎসিত ও কদাকার মনে করেন এবং স্বামীর প্রতি তাঁর মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন যে, তিনি এই ঘটনার পরে প্রিয়নবীর (স) দরবারে এসে নিম্নের বিবৃতি দেন—

> "আল্লার শপথ, আমি দ্বীনি অথবা চারিত্রিক কোন দোষের কারণে তাঁকে অপসন্দ করছিনা, বরং তাঁর সৌন্দর্যহীনতাই আমার অপসন্দ। (ইবনে জরীর)

প্রিয়নবী (স) অভিযোগ শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—

> "সে যে বাগানটি তোমাকে মোহর হিসেবে দিয়েছিল তা তাকে ফিরিয়ে দেবে ?"

তিনি জবাব দিলেন—"হাঁ, হে আল্লার রসুল !"

এরপর প্রিয়নবী (স) সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন যে, "সাবেতকে তার বাগান ফিরিয়ে দাও," এবং সাবেতকে বললেন,—"তুমি তাকে এক তালাক দিয়ে দাও।"

ইমাম করতবী সমস্যাটির ব্যাপার বিস্তারিত বলেন—"বর্ণিত আছে যে সাবেতের স্ত্রী তাঁকে অত্যন্ত অপসন্দ করতেন আর তিনি তাঁকে অত্যন্ত ভাল-বাসতেন। মামলাটি প্রিয়নবীর (স) কাছে গেলে তিনি খোল্‌য়ার মাধ্যমে উভয়কে পৃথক করে দেন—আর এটা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রে খোল্‌য়ার প্রথম ঘটনা।" তিনি আরো লিখেন—"আসলে এই হাদীসটিই হচ্ছে খোল্‌য়ার বুনিয়াদ। অধিকাংশ ফকীহ্‌ এ ব্যাপারে এই হাদীসটিকেই তাদের যুক্তি প্রমানের বুনিয়াদ বানিয়েছেন।"

এ সম্পর্কে ইমাম মালেক বলেন—"আমাদের কাছে এটা একটা সর্বজন সম্মত সিদ্ধান্ত যা আমি বিদ্বানদের মুখে বারবার শুনে আসছি। অর্থাৎ এই যে, স্বামী স্ত্রীকে কোনরকমের দুঃখকষ্ট দেয়নি এবং কোনরকমের দুর্ব্যবহারও করেনি—তাসত্বেও সে তার স্বামী থেকে পৃথক হতে চায় তাহলে তখন স্বামীর জন্যে এটা বৈধ যে সে তার দেয়া ধনসম্পদ স্ত্রীর কাজ থেকে ফেরত নিয়ে নেবে এবং স্ত্রীকে (বৈবাহিক বন্ধন থেকে) মুক্ত করে দেবে। যেমন প্রিয়নবী (স) সাবেত বিন কায়েসের স্ত্রীর ব্যাপারে করেছেন।"

ইবনে কোদামা তাঁর গ্রন্থ "আল মুগনীতে এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আর তাঁর আলোচনার মোটকথা হচ্ছে এই যে, স্ত্রী যখন তার স্বামীকে চেহারা, চরিত্র অথবা অন্য কোন কারণে অপসন্দ করে অথবা স্বামীর আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লার নির্দ্ধারিত অধিকার উপেক্ষিত হবার আশংকা দেখা দেয় তখন স্ত্রী খোল্‌য়া অর্জনের অনুমতি পাবে। এর মাধ্যমে স্ত্রী কিছু সম্পদ বা অর্থের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর কাছ থেকে মুক্ত করে নেবে। পবিত্র কোরানের এই আয়তটি হচ্ছে তার যুক্তিগত প্রমাণ—

> "যখন তোমার ভয় হয় যে স্বামী-স্ত্রী আল্লার সীমায় কায়েম থাকতে পারবেনা, তখন কোন বাধা নেই যখন নারী কিছু ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করে নেবে।'
>
> (বাকারা—২২৯)

খোল্‌য়ার সমস্যায় কাজীর ক্ষমতা

খোল্‌য়ার কারণ সমূহ গভীরভাবে তদন্ত ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখাটা কাজীর (বিচাপতির) দায়িত্ব। তিনি এটা দেখবেন যে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি ঘৃণার মাত্রা কতটুকু এবং এর প্রতিকারের বিকল্প কোন পন্থা আছে কিনা তাও তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

ইবনে কাসীর এ সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন—"হযরত উমরের (রা) আদালতে নারী এক তার মামলা দায়ের করে। সে বলে যে, সে তার স্বামীকে অপসন্দ করে এবং কোন ভাবেই তার সাথে থাকতে রাজী নয়। তিনি মহিলাটিকে উপদেশ দিয়ে তার স্বামীর সাথে অবস্থানের পরামর্শ দেন। কিন্তু মহিলাটি তা গ্রহণ করলোনা। এরপর তিনি তাকে আবর্জনাময় এক কক্ষে আটক করে দেন। একরাত ওখানে কাটানোর পর তিনি তাকে বের করে এনে জিজ্ঞেস করলেন--"রাত কেমন কেটেছে ?" মহিলাটি বললো "আল্লার শপথ, বিয়ের পর থেকে এমন আরামের ঘুম আমার আর কক্ষনো হয়নি।" একথা শুনে হযরত উমর (রা) মহিলাটির স্বামীকে ডেকে পাঠিয়ে অবিলম্বে তালাক দেয়ার আদেশ দিয়ে বললেন—"একে খোল্‌য়া দিয়ে দাও তা, তার কানের বালির বিনিময়েই হোকনা কেন।"

তাই বলে এটা বোঝানো হচ্ছেনা যে, খোল্‌য়ার প্রত্যাশী নারী মাত্রকেই আবর্জনার কক্ষে বন্ধ করে পরীক্ষা নিতে হবে। না তা নয়। হযরত উমর (রা) তাঁর বুদ্ধিমত যা করেছেন তা সেই সময় ও পরিবেশ মোতাবেক ঠিকই করেছেন। আজকালও যে তেমন ভাবে পরীক্ষা করতে হবে তেমন কোন কথা নেই। তবে, হযরত উমর (রা)-র এই ঘটনাকে সামনে রেখে এটা অবশ্যই জরুরী যে, কাজীকে বিষয়টির খুঁটিনাটি তদন্ত করে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। অবশ্য এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বভাব ও আবেগ-অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরী হবে। কারণ একটি ব্যাপার বাহ্যতঃ তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও সেটাই যদি কারো সাথে প্রতিদিন ঘটে থাকে তাহলে তা তার জন্যে অসহ্য শাস্তির মতো প্রমাণিত হয়।

স্বামীর অবাধ্যতা

অবাধ্যতা বা বিদ্রোহ যদি স্বামীর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীকেও বেশ বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার সাথে কাজ করতে হবে এবং অত্যন্ত প্রেমপ্রীতি ও কৌশলের সাথে স্বামীর অবাধ্যতার কারণ খুঁজে বের করতে হবে এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে স্বামীর মনের ঘৃণাবোধ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। এজন্যে যদি দৈহিক মানসিক বা আর্থিকভাবে কিছু ত্যাগ তিতিক্ষা স্বীকার করার দরকার হয় তাহলে তাতেও যেন ইতস্ততঃ না করা হয়। কারণ স্বামীর সম্মান একজন স্ত্রীর কাছে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার চেয়ে বেশী।

এখানে, দাম্পত্য সমস্যা সৃষ্টি কিভাবে হয়? বা স্বামীর মনে ঘৃণা বা অবাধ্যতার বীজ কিভাবে ঢোকে তা নিয়ে আলোচনা করার কোন লাভ বা দরকার নেই। এখানে শুধু এতটুকুই বলবো যে, স্ত্রীর সব সমস্যার সমাধান শুধু এই যে সে সব দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালন করবে এবং স্বামীর মন-মেজাজের দিকে লক্ষ্য রাখবে। স্ত্রীকে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও সংবেদনশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত। অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর কাছে তার পসন্দ অপসন্দ বর্ণনা করাটাকে তার পৌরুষের বিরোধী মনে করে। এজন্যে স্ত্রীকে স্বামীর চোখ আর চেহারা দেখেই অনেক কিছু বুঝে নেয়ার দক্ষতা অর্জন করা উচিত। আবার অনেক সময় স্ত্রী তার স্বামীকে বুঝতে দারুনভাবে ভুল করে বসে। ফলে পারিবারিক শান্তি শৃংখলা নষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে উম্মুলমু'মোমেনীন হযরত সাওদাহ্ বিনতে জম্‌য়ার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন প্রিয়নবীর (স) দৃষ্টিতে নিজের প্রতি কিছুটা উদাসীনতার ভাব লক্ষ্য করেন এবং এটা অনুমান করেন যে প্রিয়নবী (স) তাঁকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছেন—তখন তিনি প্রিয় নবীর (স) সামনে গিয়ে সেই উপেক্ষার কারণ জিজ্ঞেস করতে যায়নি বরং তাঁর নারীত্বই সেই আবেগ অনুভব করে নেয় এবং তিনি বুঝে নেন যে এই উপেক্ষা ও উদাসীনতার কারণ তাঁর মধ্যে কোন দোষত্রুটির জন্যে নয়, বরং ব্যাপারটা অন্য কিছু। আর তা এই যে তিনি ছিলেন প্রিয়নবী (স)-র স্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এই কারণে তিনি স্ত্রীদের

দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে পারছিলেন না। এজন্যে তিনি তাঁকে ছাড়তে চাচ্ছেন। একথা ভেবে তিনি প্রিয় নবী (স)-র কাছে গিয়ে নিজেই বললেন—"ওগো আল্লার রাসূল! আমি বৃদ্ধা হয়ে গেছি এবং স্ত্রীদের দায়িত্ব পালনের যোগ্য নই। আমি আমার বরাদ্দের দিন আপনার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে দিচ্ছি। আমার এছাড়া আর কোন আকাংখা নেই, কেয়ামতের দিন যখন আমাকে উঠানো হবে তখন আপনার স্ত্রীদের তালিকায় যেন আমারও নাম থাকে।"

উম্মুল মো'মেনিন হযরত সাওদাহ বিনতে জওয়ার প্রশংসায় কোরানের এই আয়াত নাজিল হয়—

> "যদি কোন স্ত্রী নিজ স্বামী থেকে দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার আশংকা করে তাহলে কোন বাধা নেই যে স্বামী ও স্ত্রী (কোন কোন অধিকারের বেশ কম করার ব্যাপারে) পরস্পর সমঝোতা করে নেবে। সমঝোতা সব অবস্থাতেই উত্তম। নফ্‌স সংকীর্ণ মনের দিকে শীঘ্রই আকর্ষিত হয়ে যায়। কিন্তু তোমরা যদি দয়া প্রদর্শন কর এবং খোদাভীরুতা অবলম্বন কর তাহলে বিশ্বাস রেখো যে আল্লাহ তোমাদের এই কর্মপদ্ধতি থেকে অনবহিত হবেন না।" (নিসা--১২৮)

উপরের আয়াতটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি খুব সহজেই এটা অনুভব করবেন যে--ইসলাম একদিকে যেমন নারীকে তার নিজ সমস্যার সমাধান করার পূর্ণাঙ্গ অধিকার দিয়েছে সেখানে সমঝোতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অন্য কথায়--ইসলাম, দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যাবলিকে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করাকে উত্তম মনে করে। এজন্যেই আল্লাহ বলেছেন—

> "...কোন বাধা নেই যে স্বামী ও স্ত্রী (কোন কোন অধিকারের বেশ কম করার ব্যাপারে) পরস্পর সমঝোতা করে নেবে। সমঝোতা সব অবস্থাতেই উত্তম।" (নিসা--১২৮)

স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ

এটা একটা তৃতীয় অবস্থা। এটাকে আমরা "নুসুজ" বা অবাধ্যতার অর্থে ব্যবহার করতে পারিনা। কারন "নুসুজ" বা অবাধ্যতার প্রশ্ন তখন উঠে যখন স্বামী বা স্ত্রীর কোন একজন অন্যজনের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা অবাধ্যতা প্রকাশ করে।

"নুসুজ" অর্থাৎ অবাধ্যতার ক্ষেত্রে উভয়ে পরস্পরের সাথে কেমন ব্যবহার করবে—তা নিয়ে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘৃণা ও অবাধ্যতার প্রকাশ যদি উভয় পক্ষ থেকে হয়ে থাকে—তাহলে ইসলাম তার প্রতিকার কিভাবে করবে? তাদেরকে তো আর তাদের মর্জির উপর ছাড়া যায়না।

শরীয়তের বিধিবিধান

"আলমুগনীর" গ্রন্থকার লিখেছেন—যদি" স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ দেখাদেয় তাহলে বিচারপতি বিশয়টিকে খুব ভাল করে তদন্ত করার পরই কোন সিদ্ধান্ত নেবেন। যদি এটা প্রকাশ পায় যে স্ত্রীই দোষী তাহলে স্ত্রী 'নাসেজ' বা অবাধ্য বলে গণ্য হবে। (এ সম্পর্কে) সে কি কর্ম-পন্থা অবলম্বন করবে তার বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে)। কিন্তু যদি তদন্তের পর এটা জানা যায় যে স্বামীই দোষী, তাহলে বিচারপতি এমন কোন সমাধান খুঁজে বের করবেন যাতে তিনি স্ত্রীকে স্বামীর বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচাতে পারেন।

যদি এই উভয় অবস্থায় উল্টো ব্যাপার এটা বোঝা যায় যে উভয়পক্ষ থেকেই বাড়াবাড়ি হচ্ছে উভয়ই এই ধরনের দাবী করে যে অপর পক্ষ জুলুম অত্যাচার করছে—তখন এই অবস্থায় বিচারপতি বিষয়টিকে উভয়পক্ষের পৃষ্ঠপোষকদের উপর সোপর্দ, করবেন যেন তারা ভাল করে ভেবেচিন্তে উভয়কে সুবিচার দান করেন। কিন্তু তা সত্বেও যদি উভয়ের ব্যাপারে জুলুম ও নিষ্ঠুরতার আশংকা থাকে আর এই ভয় থাকে যে তারা আল্লার নির্দ্ধারিত সীমালংঘন করতে শুরু

করবে তাহলে বিচারপতি উভয় পক্ষের পরিবার থেকে এক একজন শালিশ নির্বাচন করে উভয়কে সন্তুষ্ট করার জন্যে পাঠাবেন।"

(আল্‌মুগ্‌নী (ইবনে কোদামা) ৬ষ্ঠ খন্ড অষ্টাদশ পৃষ্ঠা)

ইসলাম যে কতো আন্তরিকতার সাথে সমস্যাবলীর সমাধান করতে চায় এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পারিবারিক শান্তি শৃংখলা রক্ষা করতে চায় তা এথেকে প্রমাণিতহয়। স্বামী স্ত্রীর উভয়ের মতভেদের নিষ্পত্তির শেষ পন্থা হিসেবে ইসলাম একাধিক বিকল্প পেশ করে বলে যে, স্বামী-স্ত্রী নিজেরা যদি পারস্পরিক সমঝোতার অবস্থায় না থাকে তাহলে উভয়ের পরিবারের পৃষ্ঠপোষকরা মিলে তাদেরকে বুঝাবে যেন একটি সুখী পরিবার অশান্তির শিকারে পরিণিত না হয়। আর এতে করেও যদি সমঝোতা না হয়ে থাকে তাহলে ইসলাম স্বামীকে এটা বলেনা যে স্ত্রীকে আশ্রিতা হিসেবে কোথাও ঠাঁই দিক। কারণ এতে বড় জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলাম বিচারপতিকে বিষয়টির ব্যাপক তদন্ত করার আদেশ এবং উভয় পক্ষকে এভাবে বুঝানোর পরামর্শ দেয় যেন ইতিবাচক রেখাপাত করে। এরপরও যদি ব্যাপারটি আরো অবনতিশীল হয়ে পড়ে তাহলে উভয় পক্ষের পরিবার থেকে দুজন নির্বাচিত শালিসকে তাদের ব্যাপারাদি পর্যালোচনা করে মতভেদের মূল কারণ খুজে বের করার জন্যে পাঠাবে। এরা তাদেরকে উপদেশ দেবেন এবং পারস্পরিক মতভেদের কুফল সম্পর্কে অবহিত করাবেন এবং অত্যন্ত স্নেহের সাথে তাদেরকে সঠিকভাবে দাম্পত্য জীবন পুর্ণবহাল করার পরামর্শ দেবেন। এরপর যদি স্বামী-স্ত্রী তাদের পরামর্শ মানার জন্যে তৈরী হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তদের সংশোধনের সুযোগ করে দিবেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ বলেন—

> "আর যদি তোমাদের কখনো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা কর তাহলে একজন শালিস পুরুষের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে এবং একজন নারীর আত্মীয়দের মধ্য নিয়োগ কর। ওরা দুইজন সংশোধন করতে চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ করে দেবেন আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব ব্যাপারে ওহাকেবহাল"। (নিসা—৩৫)

পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি সমঝোতা করানোর আবেদন বিচারপতি নিজে করবেন।

আথবা বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের অনুরোধেও তারা এই শুভপ্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারেন। কেননা একটি পরিবারকে বিশৃংখলার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে সমঝোতায় অনুপ্রাণিত করানোর এটাই উত্তম উপায়। সমঝোতা করার এই প্রচেষ্টা যদি আন্তরিকতার সাথে করা হয় তাহলে তাদের মধ্যে সম্প্রীতি পুনর্বহাল না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না।

ফ্রান্সেও ইদানিং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন মোতাবেক বিচারপতি স্বামী স্ত্রীর উভয় পরিবার থেকে দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নির্বাচিত করে তাদের মধ্যে সমঝোতা করানোর জন্যে পাঠাবেন। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কিত ইসলামী আইন ও পদ্ধতি অধিকতর বাস্তবানুগ ও কার্যকরী। ইসলাম এক্ষেত্রে মতভেদের মূল কারণ খুজে বের করে তারই প্রতিকার করে। ফলে সমস্যাটির স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধান হয়ে যায়। বর্ণিত আয়াতের এই অংশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—

"যদি তারা উভয়ে সংশোধন করতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।" (নিসা—৩৫)

উল্লেখযোগ্য যে এখানে সমস্যাটির ইতিবাচক দিকটির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা বলা হয়নি যে যদি তারা উভয়ে সংশোধন হতে না চায় তাহলে পৃথক হওয়া উত্তম। পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করার ব্যাপারে ইসলামের আন্তরিক প্রচেষ্টা যে কতো বেশী এথেকে তা অনুমান করা চলে। ইসলাম অশান্তি, বিশৃংখলা, ঘৃণা ও বিদ্বেষকে অত্যান্ত নিন্দনীয় বিবেচনা করে।

এখানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, বিভিন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞ উপরের আয়াতটিকে নির্ভেজাল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা এই যে, যদি সমঝোতাকারীদের উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং তাঁরা সমঝোতা করানোর ইচ্ছা পোষণ করেন তাহলে এই প্রতিশ্রুতিই দান করে যে, সমঝোতা অবশ্যই হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে আল্লামা জমাখশরী লিখেছেন— "যদি সমঝোতা করানোকারী উভয়-পক্ষের মধ্যে সমঝোতার উদ্দেশ্য থাকে এবং

উদ্দেশ্য যদি সঠিক হয়, মনে আন্তরিকতা ও শুভাকাংখার অনুভূতি থাকে তাহলে আল্লাহ সে কাজে সাহায্য দান করবেন এবং তাদের সমঝোতা করানোর চেষ্টাকে কবুল করে উভয়ের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার পথ সুগম করে দেবেন এবং তাদের সম্পর্ককে পুনর্বহাল করে দেবেন।"

এক্ষেত্রে হযরত উমর বিন খত্তাব (রা)-এর একটি ঘটনা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য। তিনি দুই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমঝোতা করানোর উদ্দেশ্যে দুজন শালিশ পাঠান। তারা নিজের মতো চেষ্টা করে ফিরে এসে জানান যে—"হে আমীরুল মোমেনিন, আমরা উভয় সমঝোতা করাতে ব্যর্থ হয়েছি।"

একথা শুনে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন—তোমরা উভয়ই মিথ্যে বলছো। আসল কথা হচ্ছে তোমাদের উভয়ের মনে সমঝোতা করানোর সত্যিকার আবেগ ছিল না। কেননা তোমাদের আবেগ যদি যথার্থ হতো তাহলে আল্লাহ তোমাদের এই কাজের সাহায্যদান করতেন এবং তোমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে না, এই জন্যেই যে আল্লাহ বলছেন—

> "যদি তারা উভয়ে সংশোধন করাতে চায় তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিলের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন।"

বস্তুতঃ হযরত উমরের (রা) এ কথা শতকরা একশোভাগ সঠিক ছিল। সুতরাং সংশ্লিষ্ট শালিশ দুজন লজ্জিত হয়ে আবার গিয়ে আন্তরিকতার সাথে সমঝোতা করানোর চেষ্টা শুরু করেন। বলা বাহুল্য এবার তাঁরা সফল হন এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুপ্রীতি পুনর্বহাল হয়ে যায়।

তালাকের শরীয়তি নিয়মনীতি

এর আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সৃষ্ট মতভেদের ক্ষেত্রে ইসলামী সমাধান পেশ করেছি। এখন সমস্যাটির দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করে দেখুন। মনে করুন উভয়ের মধ্যে মতভেদের দেয়াল যদি এতই কঠিন আর দুর্লংঘ্য হয়ে থাকে এবং পারিবারিক জীবনে নিত্যকার তিক্ত অভিজ্ঞতায় যদি একথা প্রমানিত হয়ে যায় যে, এই দুইয়ের একত্রে থাকা অসম্ভব—তখন এ অবস্থায় ইসলামের আদেশ কি?

এ সমস্যার সমাধান তালাক নয় কি ?

জী হ্যাঁ, এর একমাত্র সমাধান—শুধু তালাক।

কিন্তু এই তালাক জিনিষটা কি ? এটা কখন কিভাবে দিতে হয় ? এবং এর নিয়মনীতিই বা কি ?

আমাদের অধিকাংশ ভাই এটাও জানেন না যে, কোন্ সময় তালাক দেয়া বৈধ এবং কোন্ সময় অবৈধ। ইসলাম তালাকের নিম্নলিখিত নীতি প্রণয়ন করেছেন।

১। হায়েজ (মাসিক ঋতু) অবস্থায় তালাক দেয়া বৈধ নয়।

২। পবিত্র অবস্থায়—যখন উভয়ে সহবাস করছে—তাতেও তালাক দেয়া সঠিক নয়।

এই দুটি নীতি পবিত্র কোরানের এই আয়াত থেকে গ্রহণ করা হয়েছে—

"হে নবী ! যখন তোমরা নারীদের তালাক দাও, তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দিও।" (তালাক —১,)

এই আয়াতের যথার্থ ব্যাখ্যা ছিল প্রিয় নবীর (স) সেই বিখ্যাত সিদ্ধান্ত যা তিনি হযরত আবদুল্লাহ বিন উমরের ব্যাপারে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর নিজের স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় তালাক দিয়েছিলেন। একথা জানতে পেরে প্রিয়নবী (স) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং বলেন যে—

"তার উচিৎ দাম্পত্য সম্পর্ক পুর্নবহাল করা; এরপর তাকে রুখে রাখে যতক্ষণ না সে পাক হয়ে যায়—এরপর আবার হায়েজ হবে আবার পাক হবে এরপর যদি সহবাসের আগে পাক অবস্থায় তাকে তালাক দেয় তাহলে এটাই তার সেই ইদ্দত হবে যার হুকুম আল্লাহ তাঁর বাণীতে দিয়েছেন।"

এরপর তিনি কোরানের সেই আয়াত, পড়েন—

"তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দিও।"

সান্আনী তাঁর গ্রন্থ "সাবলু-স্ সালাম"-এ এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন "এই হাদীস একথার প্রমাণ যে স্বামী প্রথম পাকীতে নয় বরং

দ্বিতীয় পাকীতে তালাক দেবে। এভাবে ইদ্দতের গণনা সেই পাকী থেকে করা হবে যাতে সহবাস করা হয়নি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোরানী আয়াতটির যথার্থ এই হবে যে, নিজ স্ত্রীদের এমন পাকীতে তালাক দিও যাতে তুমি তার সাথে সহবাস করনি।

তালাকের ব্যাপারে ইসলামের এই আইন ও নীতির মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এখানে তার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ উপকারী প্রমাণিত হবে বলে আশা করি।

তালাক দেয়ার ব্যাপারে এত বিলম্বের ব্যবস্থা হাতে নেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, হতে পারে এই সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেমপ্রীতির সম্পর্ক পুণর্বহাল হয়ে যাবে যা এর আগে চিন্তা করাই যেতোনা। এছাড়া নারী সব সময় দুটি অবস্থায় থাকে। একটি পাক অবস্থায় আর অন্যটি হায়েজের অবস্থায়। এখন স্বামী যদি হায়েজের অবস্থায় তালাক দেয় তাহলে তার তালাক হারাম হবে। আর পবিত্র অবস্থায় যদি সহবাসের পরে তালাক দেয় তাহলে তাও হারাম হবে। এজন্যে স্বামীকে তালাক দেয়ার জন্যে পুরো দুটি হায়েয ও একটি পাকী অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। আর এতে করে প্রায় একমাস সময় লেগে যায়। এই সময়ের মধ্যে এমন পরিস্থির সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় যাতে তার অভিমত পাল্টে যেতে পারে এবং সে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এই কারণেই কোরানের সংশ্লিষ্ট আয়াতের শেষাংশে আশাব্যাঞ্জক পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—যখন স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করে এবং এজন্যে এক মাসের অপেক্ষায় থাকে যেন স্ত্রীর পাকী এসে যায়—এমতাবস্থায় সে যদি জানতে পায় যে, যে স্ত্রীকে সে তালাক দিতে চাচ্ছে সে গর্ভবতী হয়ে গেছে এবং তারই সন্তানের মা হতে যাচ্ছে—তখন তাকে তালাক দেয়া থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে এটিও একটি প্রভাবশালী কারণ প্রমাণিত হয়।

সুন্নাতী তালাক ও বিদআতী তালাক

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন—"ফকীহ্‌রা উল্লেখিত কোরানী আয়াত ও হাদীস থেকে তালাকের আইনকানুন প্রণয়ন করেছেন আর এথেকেই তারা তালাককে সুন্নাত ও বেদয়াতে বিভক্ত করেছেন। অতএব, তালাকে সুন্নাত বলা হবে ঐ তালাককে যা পাকীর অবস্থায় (সহবাসের আগে) অথবা গর্ভাবস্থায় দেয়া হয় যখন গর্ভের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তালাকে বেদয়াত হচ্ছে সেই তালাক যা হায়েজের অবস্থায় দেয়া হয় অথবা পাকীর অবস্থায় সহবাসের পরে দেয়া হয়, এবং এটা জানা যায়নি যে স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে বা গর্ভহীন আছে।

ইসলামে তালাকের এই প্রকারভেদ সম্পর্কে অনেক লোকই অজ্ঞাত। এজন্যে অনেকেই সুন্নাত ও বেদয়াতের পরওয়া না করেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে। তারা হালাল হারামেরও কোন বাছবিচার করেনা। তালাক কখন দেয়া যায় আর কখন যায়না এটা জানেনা বলেই তারা ভুলের পর ভুল করে যায়। মুসলমানদের জন্যে এই অজ্ঞতা বড়ই লজ্জার কথা। আজকাল অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে মুসলমানদের একটি বিরাট অংশ ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, এমনকি দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যাপারে ইসলামের স্পষ্ট শিক্ষা সম্পর্কেও অনবিহিত। ইসলামী শিক্ষা ও নীতি সম্পর্কে মুসলিম নর-নারীর এই অজ্ঞতা অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রতিটি মুসলমানকে ইসলামের এসব শিক্ষা সম্পর্কে অবগতি অর্জন করা খুবই জরুরী, কারণ আল্লাহ নিজেই তাদেরকে তালাক সম্পর্কিত আয়াতেই সাবধান করে দিচ্ছেন যে, তারা যেন আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন না করে আর যারা আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করে তারা আসলে নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করে। আল্লাহ বলেছেন—

> "এটা আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা, আর যারা আল্লার নির্দ্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারা স্বয়ং নিজেদের উপর অত্যাচার করবে। তোমরা জাননা; হতে পারে, আল্লাহতায়ালা এর পরে কোন নতুন পন্থা সৃষ্টি করে দেবেন!"

উপরের বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাকে বেদয়াত হারাম অর্থাৎ নিষিদ্ধ। অবশ্য তার কার্যকরী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন মত রয়েছে।

এক পক্ষ মনে করেন তালাকে বেদয়াত হারাম হওয়া সত্ত্বেও তা তালাক হিসেবে কার্যকরী হয়ে যায়। তাঁদের মতে তালাকদাতা হারাম কর্ম করেছে সত্য, কিন্তু তাতে তালাক কার্যকরী হয়ে যায়। রইলো শাস্তির কথা। তা শুধু আল্লারই এক্তিয়ারে রয়েছে।

অন্যপক্ষ বলেন এভাবে তালাক কার্যকরী হয়না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে ইমাম আহমদ, আবুদাউদ ও নাসাঈ বর্ণিত হাদীস। এই হাদীসে স্বয়ং আবদুল্লাহ বিন উমরের (রা) বর্ণনা মোতাবেক আল্লার রাসূল (স) তা নাকচ করে দেন এবং অকার্যকরী ঘোষণা করেন।

অন্য এক বর্ণনায় আবদুল্লাহ বিন উমর বলেন—"তিনি তাঁর স্ত্রীকে হায়েযের অবস্থায় তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাকে এক অর্থহীন ব্যাপার বলে অভিহিত করেন।"

আল্লামা ইবনে আবদুল বারি বলেন—"এর বিরোধীতা বিদাতী এবং হীন লোকেরা ছাড়া আর কেউ করেনি।"

শওকানী তাঁর 'নায়নুল আওতারে' তালাক বিরোধীদের বর্ণনাকে তালাক সমর্থকদের বর্ণনা থেকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং "সানআনী"ও তাঁর "সুবুলুসসালাম" এ শওকানীর কথা সমর্থন করেছেন। এ ব্যাপারে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে "তালাকে বেদয়াত"কে আল্লাহ্ হারাম ঘোষণা করেছেন এবং এই কর্ম আল্লার নির্দেশ ও অনুমতি ছাড়াই করা হয়। এজন্যে এ ধরনের কর্ম বাতিল হবে যার উপর কোন রকমের শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যাবেনা। এর যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে প্রিয়নবীর (স) এই বাণী ঃ

"যে কাজ সম্পর্কে শরীয়তের কোনও নির্দেশ নেই তা পরিত্যক্ত।" এ ব্যাপারে দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে "এটা বেদয়াত এবং প্রত্যেক বেদয়াতই বিভ্রান্তি

এবং বিভ্রান্তির উপর কোনো শরীয়তী আইন প্রবর্তিত করা যায়না। এজন্যে এই তালাক কার্যকরী হবেনা বরং বাতিল হয়ে যাবে।

যাইহোক এসব মতভেদের কথা বাদ দিলেও আমরা যখন তালাক সম্পর্কিত সর্বসম্মত আইন ও নীতির উপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে একথা স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, ইসলামী সমাজে ব্যক্তির দাম্পত্য ও সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির ব্যবস্থাবলী যেভাবে করা হয় অন্য কোথাও তার চিন্তাও করা যেতে পারেনা। আল্লার দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন এই সরল-সহজ ও সত্যপথে আমাদের পরিচালিত করেন।

তালাকের শিষ্টাচার

প্রশ্ন উঠে, যদি স্বামীর শেষ আপোষ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় এবং তার জন্যে স্ত্রীকে তালাক দেয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে—তাহলে তার পন্থা ও উপায় কি ?

এ প্রশ্নের জবাবে আল্লার এই বাণীকে বুনিয়াদ হিসেবে পেশ করা যেতে পারে—

> "তালাক দুবার। এরপর হয়তো সহজভাবে নারীকে রেখে দেয়া হবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেয়া হবে।" (বাকারা—২২৯)

উপরের বর্ণিত আয়াতের অর্থ মোতাবেক শরীয়তী তালাক তখনি স্বীকার করা হবে যখন তা কিছু সময়ের ব্যবধানে দেয়া হবে। আয়াতের শাব্দিক অর্থেও তাই বুঝা যাচ্ছে। এজন্যে আয়াতের ইঙ্গিত এ কথার দিকে রয়েছে যে, স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনর্বহালের অধিকার শুধু দু' বার পাওয়া যাবে—এই শর্তে যে তালাক কিছুদিক পরপর দেবে। কোন কোন উলামা এ প্রসঙ্গে হযরত উমর, উসমান, আলী, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ, আবদুল্লাহ বিন উমর, ইমরান বিন হোসাইন, আবু মুসা আশয়ারী, আবুদারদা এবং হুজাইফা বিন আল ইয়ামান (রা) প্রমুখের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এজন্যে একই বারে তিন তালাককে শুধু এক তালাক

বলে মানা হয়েছে। রাসূল (স)এর আমল, হযরত আবুবকর (রা) খিলাফতকাল এবং হযরত উমর (রা) খিলাফতকালীন দুবছর পর্যন্ত এই বিধান ও নীতিই প্রচলিত ছিল। (কিন্তু পরে এই সুযোগের অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগের কারণে হযরত উমর (রা) কিছুটা কড়াকড়ি করার প্রয়োজন বোধ করেন।) এ সম্পর্কে হযরত উমর (রা) নিজেই বলেছেন—

> "লোকেরা এমন এক ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে থাকে যাতে তাদের জন্যে নম্রতা রাখা হয়েছিল, এজন্যে আমাদের মতে তা প্রবর্তন করে দেয়া উচিৎ অতএব তা প্রবর্তন করে দেয়া হয়েছে।"

অর্থাৎ এই যে, যখন হযরত উমর (রা) আলমে এই পরিস্থিতি দাঁড়ায় যে লোকেরা শরীয়তের নম্রনীতি থেকে অবৈধ উপকার আর্জন করতে শুরু করে এবং নবীর সুন্নাতের প্রতি উপেক্ষা করে বাববার তালাক দিতে থাকে কিন্তু রাসূলের ভক্ত প্রেমিক উমর (রা) রাসূলেরই সুন্নাতের প্রকাশ্য বিদ্রূপ সহ্য করতে পারলেন না তিনি একই সাথে দেয়া তিনটি তালাকই কার্যকরী হবে বলে আদেশ জারী করেন যাতে রাসূলের সুন্নাতের বাহানায় সুযোগের অপব্যবহার করতে না পারে এভাবে একই সাথে একই বারে দেয়া তিনটি তালাককেই কার্যকরী হবার কথা ঘোষণা করে তিনি তালাক নিয়ে ক্রীড়ারত লোকদের সতর্ক করে দেন যাতে করে তালাকের অনুপাত হ্রাস পেতে পারে।

ইমাম নাসাঈ মাহমুদ ইবনে লাবীদ (রা) এর মাধ্যমে, একই বারে তিনটি তালাকের অবৈধতা সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন—

প্রিয় নবীকে এমন এক লোকের ব্যাপারে জানানো হয় যে একই সাথে নিজের স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়।" এই ঘটনা শুনে প্রিয়নবী রাগে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন—

> "আল্লার কিতাবের সাথে কি এধণের ঠাট্টা করা হবে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।"

প্রিয়নবীর একথা শুনে দু ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললো—

> "হে আল্লার রাসূল! আমরা কি তাকে কতল করে দেবোনা?"

হযরত উমরের জারীকৃত আদেশ সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় সে স্বয়ং তাঁর বর্ণনা মোতাবেক, তাঁর এর মাধ্যমে লোকদের তালাকের প্রবণতা থেকে রুখে রাখাটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটা দেখা যায় যে হযরত উমরের এই নীতিও লোকদেরকে পুরোপুরি সংশোধন করতে পারেনি এবং তারা বরাবর একই ভুল করে যাচ্ছিল। এজন্যে এখন আমাদের কে কেবল রাসূলের সুন্নাতের উপরই অবিচল থাকা উচিৎ। কারণ এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অর্থাৎ একই সাথে দেয়া তিন তালাককে এক তালাক বলেই গণ্য করতে হবে।

কোন কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞের এই অভিমতও রয়েছে যে একই সাথে তৃতীয় তালাকটি আদপেই কার্যকরী হয় না। বস্তুত ঃ এটা এক তালাকও হয়না আবার তিন তালাকও হয় না, কারন এটা হচ্ছে তালাকে-বেদয়াত, এবং এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে আরো যথাযথ যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে।

যাই হোক এই বিস্তারিত আলোচনায় আমাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা দেখানো যে, তালাকের মতো বিষয়ে তাড়াহুড়া করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। খোদা না করুন, কেউ যদি এই অবস্থার শিকারে পরিণত হয় তাকে অত্যন্ত ধৈর্য ও বুদ্ধি-বিবেচনার পরিচয় দিতে হবে যেন এ ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ না হয়। বলাবাহুল্য ইসলাম মানব জীবনের স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করে।

আচ্ছা, এবার এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে থাকে তাহলে কি তক্ষুণিই তাদের মধ্যেকার সব সম্পর্কের অবসান ঘটে? পর মুহূর্তেই কি তারা পরস্পরের কাছে অচেনা হয়ে যাবে? এসব প্রশ্নেরই বিস্তারিত জবাব সামনের আলোচনায় তুলে ধরছি।

ইদ্দত

ইসলামী আইন শাস্ত্রে তালাকের পর একটি নির্দ্ধারিত বিরতি-অপেক্ষাকে ইদ্দত বলা হয়। তালাক পাওয়ার পর স্ত্রী এই ইদ্দত পালন করে, এটা একটা

শরীয়তী আদেশ। এই আদেশের অধীনে তালাকপ্রাপ্তা মহিলা ইদ্দত পালন কালে নিজের সাবেক দাম্পত্য অধিকার ও দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক সীমারেখা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন জীবন শুরু করে। তখন তার উপর স্বামীর প্রাধান্যেরও অবসান ঘটে এবং সে নিজেই সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে।

ইদ্দতের বিধি বিধানকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) সহবাসের আগেই যে তালাক দেয়া হয় তার আদৌ কোন 'ইদ্দত নেই। এর যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র কোরানের এই আয়াত—

> "হে ঈমানদারেরা! যখন তোমরা মোমেন নারীর সাথে বিয়ে কর এবং এরপর তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দিয়ে থাক তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে ওদের উপর কোন ইদ্দত দরকারী নয়—যার পুর্নতার দাবী তোমরা করতে পার। অতএব, তাদেরকে কিছু সম্পদ দাও এবং ভদ্রভাবে বিদায় কর।" (আহযাব—৪৯)

(২) তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীটি যদি এমন বৃদ্ধা হয় যে তার হায়েয (মাসিক ঋতু) আসাটাই বন্ধ হয়ে গেছে, অথবা এতো অল্প বয়স্কা যে তার হায়েয (মাসিক ঋতু) শুরুই হয়নি—তাহলে এমন নারীদের ইদ্দত হবে তিন মাস। আর এর যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে এই আয়াত—

> "এবং তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা হায়েয সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে তাদের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ হয়ে থাকে (তাহলে তোমরা জেনে রাখ) তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর একই আদেশ ওদের জন্যেও যাদের এখনো হায়েয আসেই নি।'

(৩) হায়েয বা ঋতুবতী নারীদের ইদ্দত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছটা মত পার্থক্য রয়েছে। কেউ বলেন তিনি হায়েয আর কেউ বলেন তিনি পাকী তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ হচ্ছে পবিত্র কোরানের এই আয়াতটি—

"যে সব নারীকে তালাক দেয়া হয়েছে তারা
তিন কুরূ' অপেক্ষা করবে।"

কুরূ' শব্দটি আরবীতে একইভাবে হায়েয এবং পাকী উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থের এই ঐক্যই হচ্ছে তাঁদের মতপার্থক্যের বুনিয়াদ।

(৪) গর্ভবতী নারীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আর তার যুক্তি প্রমাণ হচ্ছে কোরানের এই আয়াত—

"এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতের সীমা হচ্ছে (এই যে) তাদের গর্ভ খালাস হওয়া।" (তালাক-৪)

এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইদ্দতের সময়ও নেহায়েত কম অপেক্ষা নয় বরং এটা এতো দীর্ঘ যে তা একটি ভুলের সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট। এর দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম উদ্দেশ্য আসলে ভুলের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আরেকটি সুযোগ সরবরাহ করা।

ইদ্দতকালীন কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা

ইদ্দতকালীন সময়ে নারীর মান তার স্বামীর জন্যে একেবারে অচিনের মতোও হবেনা আবার স্ত্রীসুলভও হবেনা, বলা যায় ঠিক মধ্যম অবস্থায় থাকে। এই মধ্যম অবস্থার বিস্তারিত বিবরণ শরীয়তের নিম্নবর্ণিত আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

১—তালাকের পরও নারীর মান অন্যান্য সব ব্যাপারে স্ত্রীর মতোই থাকে এবং ইদ্দতকালে তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়ার কোন অধিকারই স্বামীর নেই। এর যুক্তিপ্রমাণ হচ্ছে কোরানের এই আয়াত...

"হে নবী! যখন তোমরা নিজেদের নারীকে তালাক দাও তখন তাদেরকে তাদের ইদ্দতের জন্যে তালাক দিও এবং ইদ্দতের সময় ঠিক ঠিক গণনা করো এবং আল্লাহকে ভয় করো। তিনি তোমাদের প্রতিপালক। (ইদ্দতের সময়) তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করবে না এবং তারা নিজেরাও বেরুবেনা। (তালাক—১)

এতে সন্দেহ নেই যে এক ঘরে উভয়ের একসাথে বসবাস করানো এবং এত নিকটে রাখাটা উদ্দেশ্যহীন নয় আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়ের মধ্যে সমঝোতার উত্তম সুযোগ সরবরাহ করা।

(২)—তালাকপ্রাপ্তা নারীর জন্যে ইদ্দতের সময় স্বামীর থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। অবশ্য খুব জরুরী কাজে বেরুতে পারে। অন্যথায় উদ্দেশ্যহীন বেরুলে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু তাতে তার ইদ্দত বাতিল হবেনা।

(৩)—ইমাম আবু হানীফার অভিমত হচ্ছে ইদ্দতের সময় নারীকে খুব সাজ-সজ্জা ও রূপ চর্চার সাথে থাকা উচিৎ, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি পরা উচিত, উৎকৃষ্ট মানের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা উচিৎ—এবং এভাবে থাকা উচিৎ যাতে তার স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

(৪)—ইদ্দতের সময় যদি স্বামী অথবা স্ত্রীর মধ্যে কেউ মারা যায় তাহলে উভয়েই একে অন্যের উত্তরাধিকারী হবে।

(৫)—ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নারী বিয়ে করতে পারবেনা, ইদ্দতের সময় সে তার কাছেই থাকবে এবং ইদ্দতের সময় স্বামী যখনই ইচ্ছে করবে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে, তা স্ত্রী এটা পছন্দ করুক বা না করুক তাতে কিছু আসে যায়না। কেননা আল্লাহ বলেছেন—

> "তাদের স্বামী সম্পর্ক পুনর্বহালের ব্যাপারে সম্মত হলে তারা এই ইদ্দতের সময় তাদেরকে আবার নিজেদের স্ত্রীত্বে ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকারী রয়েছে।" (বাকারা—২২৮)

এই আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে ইদ্দতকালীন সময়ে স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করার অধিকার স্বামীর রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে এ ব্যাপারে দুজন সুবিচারককে সাক্ষী বানিয়ে নিবে। আল্লাহ বলেছেন—

> "এবং নিজেদের মধ্যে থেকে এমন দুজন ব্যক্তিকে সাক্ষী বানিয়ে নাও যারা হবে সুবিচারক।" (তালাক—২)

কিন্তু ইদ্দতের নির্দ্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে স্বামী যদি তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সেই অধিকার আর তার থাকবে না।

ইদ্দতের পর নারী তার সাবেক স্বামীর জন্যে একেবারে অপর ও অপরিচিতা নারীর মতো হয়ে যাবে, এবং উভয়েই পরস্পরের অপর ও অপরিচিত জনের মতো হয়ে যাবে। এর পর নির্দিষ্ট আইন মোতাবেক নতুন করে বিয়ে করেই কেবল তারা আবার স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক কায়েম করতে পারে এবং এ ব্যাপারে সাবেক স্বামীর প্রস্তাব গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে নারী সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের বিধিব্যবস্থা

ইদ্দতের সময়ে স্বামী যদি দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করে নতুন জীবন শুরু করে এবং এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হলে আবার যদি এমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় যার ফলে দ্বিতীয়বারও তালাক দিতে হয় তাহলে আবার সেই আইনগুলো নতুন করে পালন করতে হবে যা আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি। এমনকি দ্বিতীয় তালাকের পরও যদি সে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে চায় তাহলে সে দ্বিতীয় ইদ্দতকালীন সময়ে তা করতে পারে।

কিন্তু তার জানা উচিৎ এরপর যদি সে আবার তালাক দেয় তাহলে তার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের আর কোন অধিকার থাকবে না। কেন না সে আল্লার পক্ষ থেকে দেয়া সুযোগ ইতিমধ্যেই ব্যবহার করে নিয়েছে এবং তৃতীয়বার তালাক দেয়ার সময় তাকে এটা মনে রাখতে হবে যে এবার তার স্ত্রী জরুরীভাবে পৃথক হয়ে যাবে এবং হালাল করা ছাড়া সে আর তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল করতে পারবে না। সুতরাং তৃতীয় তালাক দেয়ার আগে সে হয় স্ত্রীকে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে রাখবে অথবা ভদ্রভাবে বিদায় করে দেবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাসের এই বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"যখন স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়ে দেয় তাকে তৃতীয় তালাক দেয়ার সময় আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ (এবং দুই তালাকের পরই তার উচিত) চাইলে সে ভদ্রভাবে তার স্ত্রীকে রাখবে অথবা চাইলে ভদ্রভাবে পৃথক করে দেবে এবং স্ত্রীর অধিকারের দিকে পুরোপুরি লক্ষ্য রাখবে।

পুরুষকে, আবার দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহালের সুযোগ দানের পেছনে শরীয়তের উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ এই যে, স্ত্রীর বিচ্ছেদ এবং তার একাকীত্বের পুরোপুরি অনুভূতি জানা। এসময় এমন বিরক্তি ও মানসিক পীড়া অনুভব করে যে তা বর্ণনার অতীত। তালাক দেয়ার আগে সে এই বিরক্তি ও মানসিক পীড়ার কথা পুরোপুরি অনুমান করতে পারেনি। তার এই অজ্ঞতার কারণেই হয়তো আল্লাহ তাকে এই দুঃখ ও মর্ম-পীড়ার হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্যেই এই বিশেষ সুযোগ দিয়েছেন। উপদেশ ও অভিজ্ঞতা একবারেই পূর্ণ হয়ে যায়না বলে তাকে দু'দুবার এই সুযোগ দেয়া হয় যাতে সে তার বিষয় বিবেচনায় ভুল না করে এবং তার একাধিক সুযোগ লাভের অধিকারও পূর্ণ হয়।

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন ব্যক্তি দু'দুবার তালাকের ফলাফল সম্পর্কে অবগতি অর্জন করে তখন তৃতীয়বার তালাক সে সব কিছু জেনে বুঝে এবং দেখে শুনেই দেয়। সে যখন দেখে যে স্ত্রীর বিচ্ছেদেই তার কল্যাণ তখন সে তালাক দেয়—নয়তো সে ভদ্রভাবে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে তাকে রেখে দেয়। এটা বস্তুতঃ অজ্ঞ ও অবুঝ বান্দাহদের প্রতি আল্লার এক বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত আমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কের অবনতি-তাদের দাম্পত্য বিভেদ ও সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান এবং তালাকের শরীয়তী নীতি ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। তালাকের প্রকারভেদ ও কার্যকারিতা ও অকার্যকারিতা সম্পর্কেও আলোচনা করেছি। এসব আলোচনার ফলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব ও উপকারীতা এবং মানব সমস্যাবলীর সমাধানে ইসলামের গভীর আন্তরিকতার প্রমাণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে করে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব ভিত্তির ও ভারসাম্যপূর্ণতার ছবিও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ইসলাম যে সহজ ও উদারনৈতিক জীবনাদর্শ এবং এতে যে চরমপন্থার কোন স্থান নেই—আমাদের আলোচনা থেকে সেই সত্যতাও ফুটে উঠেছে।

পরিশেষে আমরা নারী সমস্যা নিয়ে হৈ-চৈকারী এবং দাম্পত্য ও পারিবারিক ব্যবস্থার ঘোল আনায় মেকী উদ্বেগ প্রকাশকারী ভাই-বোনদের বলবো।

যে কৃত্রিম মায়াকান্নার অভিনয় না করে সমস্যায় গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করুন; বুদ্ধি বিবেক সহকারে ইসলামী সমাধান সম্পর্কে অধ্যায়ন করুন এবং ইসলাম সম্পর্কে মুখর্তাপূর্ণ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন। সত্যিকারই অর্থে পড়াশুনা করে থাকলে আপনারাও এটা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে নারী সমস্যা তথা দাম্পত্য ও পারিবারিক সমস্যার সবচেয়ে সহজ ও উত্তম সমাধান শুধু ইসলামই পেশ করেছে। এই সত্যতা সম্পর্কে যদি আপনাদের কারো সন্দেহ বা ভিন্নমত থাকে তাহলে বলুন যে, মানবিক মর্যাদা মানুষের স্বভাব ও সুযোগ সুবিধের সামগ্রিক দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন্ আদর্শ রয়েছে যে এসব সমস্যাবলীর স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছে?

এখানে আমরা ওসব লোকদেরকে গঠনমূলক চিন্তাভাবনার আমন্ত্রণ জানাবো যারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুখের এক ঠুনকো ঝটকায় দাম্পত্য সম্পর্কের অবসান ঘটাতে চায়। তাদের বুঝা উচিত যে শরীয়তের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের জন্যে এক সুখী, সুন্দর ও কল্যাণকর ব্যবস্থা উপহার দিয়েছেন। এটা পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতার জন্যে যে কতো অপরিহার্য ও উপকারী তা খুব ভাল করেই যেন তারা জেনে-বুঝে রাখে।

তালাক—ইসলাম ও খৃষ্টবাদের দৃষ্টিতে

পেছনের দীর্ঘ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা যে কেউ দাবী করে বলতে পারেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক একটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অবাঞ্ছিত কাজ। এর অনুমতি কেবল তক্ষুণিই দেয়া হয় যখন এছাড়া অন্য কোন উপায় অবশিষ্ট থাকে না। আর এর অনুমতি দানের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তিকে এক জটিল ও অসহ্যকর অবস্থা থেকে মুক্তি দেয় এবং দুই চরমপন্থার মাঝখানে স্বস্তি ও মুক্তির পথরেখা এঁকে দেয়। ইসলামের তালাক সংক্রান্ত পুরো ব্যবস্থাটি অধ্যয়নের পর যে কোন্ ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে এটাই সমস্যার স্বাভাবিক সমাধান এবং এটাই একান্ত বাস্তব উপযোগী জীবন ব্যবস্থা।

মনে করুন ইসলাম যদি তালাকের অনুমতি না দিতো তাহলে বাস্তব জীবন যে কত কঠিন সমস্যাবলীর সৃষ্টি হতো তার অনুমান কারাও মুশকিল।

একটি পাগল বা ব্যাধিগ্রস্থ,, বা দুশ্চরিত্র বা অত্যাচারী ধরনের স্বামী অথবা স্ত্রী যদি একবার পরস্পরের গলায় বেঁধে দেয়া হতো তাহলে সারাটি জীবন তাদের সীমাহীন তিক্ততা আর বিশৃংখলার মধ্যে কেটে গেলেও পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে বাঁচার কোন পথ থাকতো কি ? এভাবে উভয়ের মধ্যে কোন একজন যদি বদ্ধপাগল অথবা ভ্রষ্ট অথবা মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে পড়তো অথবা কারো স্বামী যদি নির্মম নিষ্ঠুর অথবা স্ত্রী যদি কুলটা বা বদ্-মেজাজী হতো তাহলে তালাকের উপায় না থাকলে তারা উভয়েই সারা জীবন অসহ্য মর্মপীড়ার যাতনায় ধুকে ধুকে কাটাতে বাধ্য হতো, উভয়ের মানবিক মর্যাদা, অধিকার ও দায়িত্ব দারুণভাবে খর্ব হতো। এতে করে অত্যাচারী স্বামী তার অপসন্দ স্ত্রীর সাথে জঘন্য জুলুম করতো এবং তাকে সবরকমের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে জানোয়ারের মতো বেগার খাটাতে বাধ্য করতো।

এ ধরনের আরো অনিবার্য্য কারণ রয়েছে যার ভিত্তিতে ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবন-যাপনের অনুমতি দিয়েছে। আর পৃথক হবার দুটি আলাদা নীতি ও ব্যবস্থা দিয়েছে যা নারীর বেলায় খোল্‌আ আর পুরুষের বেলায় তালাক বলে পরিচিত। নিঃসন্দেহে এ দুটি নীতি ও ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের মানবিক স্বাধীনতা, অধিকার ও মর্যাদার স্বভাবসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে।

খৃষ্টবাদের দিকে তাকালে আমরা দেখি সেখানে ধর্মীয়ভাবে তালাকের কোন ব্যবস্থা বা অবকাশই রাখা হয়নি। খৃষ্টবাদী ধারণা মোতাবেক আল্লাহ পুরুষ ও নারীকে সৃষ্টি করেছেন। এজন্যে একবার কোন পুরুষও নারী আল্লার নাম নিয়ে একসাথে জীবন-যাপনের পদক্ষেপ নিলে তারা উভয়ে একই শরীরের মতো হয়ে যায়, এরপর তাদের পরস্পর আলাদা হওয়া মোটেই ঠিক নয়। কারণ যে বন্ধন আল্লার নাম নিয়ে বাঁধা হয়েছে তা ছিন্ন করার ক্ষমতা কোন মানুষেরই নেই।

কথিত আছে হযরত ঈশা (আ) তাঁর শিষ্যদের এ ধরনের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন—

> "পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে এভাবে লেপ্টে যাওয়া উচিত যেন উভয় এক দেহ এক প্রাণ হয়ে যায়, তারা দুজন কখনো একে অন্য থেকে আলাদা হবে না, কেননা যাকে আল্লাহ্ একত্রিত করেছেন তাকে মানুষ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।" (অতি—১৯ ঃ ৬)

খৃষ্টবাদে তালাকের অবকাশ শুধু এক অবস্থায় দেওয়া হয়েছে তা হলো যখন তাদের মধ্যে কোন একজন দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করে (অর্থাৎ ব্যাভিচার করে)। এছাড়া তালাক বৈধ হবার আর কোন উপায় নেই।

বলাবাহুল্য, এ ধরনের বিধিনিষেধ হচ্ছে এক ধরনের চরম পন্থা, যা বাস্তব জীবনে কার্যকর করা অত্যন্ত মুশকিল এমনকি অসম্ভব বলা যেতে পারে। এজন্যেই আমরা দেখতে পাই যে, প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় এক্ষেত্রে কিছুটা উদারনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন মনে করেছে এবং ব্যাভিচার ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও তালাকের অবকাশ বের করেছে।

খৃষ্টধর্মে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য বিয়ে করে তাহলে সে ব্যাভিচারের অপরাধী বলে সাব্যস্ত হয়। এভাবে যদি নারী তার প্রথম স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোন পুরুষের সাথে বিয়ে করে তাহলে বাইবেলের আইন মোতাবেক সেও ব্যাভিচারিণী বলে গণ্য হবে।

মারকস এর বাইবেলে বলা হচ্ছে—

"যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দ্বীতীয় বিয়ে করেছে তাহলে সে যেন তার সাথে ব্যাভিচার (যেনা) করেছে। এভাবে যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিয়ে করে তাহলে সেও ব্যাভিচারিণী সাব্যস্ত হবে।"

(মারকস ১০, ১১,১২)

কিন্তু ইসলাম ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ার পর নারীকে নিজের ইচ্ছামতো যে কোন পুরোষের সাথে বিয়ে করার স্বাধীনতা দান করে, তা তার প্রথম স্বামীর কাছ থেকে সে তালাক পেয়ে থাকুক বা খোলআ অর্জন করে

থাকুক। এভাবে পুরুষও দ্বিতীয় বিয়ে করার ব্যাপারে স্বাধীন। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরানের ভাষ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—

"স্বামী-স্ত্রী যদি একে অপর থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ নিজের অফুরন্ত অদৃশ্য ভান্ডার থেকে প্রত্যেককে লালন পালন করবেন।" (নিসা-১৩০)

উপরে বর্ণিত আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যাকাররা লিখেছেন, "এই আয়াতের তাৎপর্য এই যে, যদি শরীয়তের আইন মোতাবেক তালাক দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহতাআলা স্ত্রীকে সাবেক স্বামীর চেয়েও উত্তম স্বামী এবং স্বামীকে সাবেক স্ত্রীর চেয়েও উত্তম স্ত্রী দান করবেন এবং উভয়ে দ্বিতীয় বিয়ের পর নিজেদেরকে উত্তম অবস্থায় পাবে এবং তাদের যাবতীয় সমস্যাকে অল্লোহতাআলা সহজ করে দিবেন।

বস্তুতঃ ইসলামের এই শিক্ষা মানব স্বভাবের সাথে একান্তই সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অনুকূল।

অসংখ্য ধন্যবাদ, সেই মহান দয়াময় আল্লাহকে যিনি আমাদেরকে ইসলামের মতো সুন্দর ও সহজ জীবন-ব্যবস্থা দান করেছেন।

——

চতুর্থ-পরিচ্ছেদ

হালালা

উপস্থাপনা

আল্লাহ বলেছেন—

> "এরপর যদি (দ্বিতীয়বার তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয় বার) তালাক দিয়ে থাকে তাহলে সেই নারী এরপর ওর জন্যে হালাল হবে না। তবে যদি তার বিয়ে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে হয় এবং সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন যদি প্রথম স্বামী এবং এই নারী উভয়ে এই ধারণা করে যে, আল্লাহর সীমায় কায়েম থাকবো তাহলে ওদের জন্যে একে অন্যের দিকে রুজু করাতে কোন বাধা নেই।"

উপরের আয়াত শরীফের অর্থ এই যে, যখন এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে নির্ধারিত ইসলামী আইনবিধি মোতাবেক দুই তালাক দিয়ে থাকে তখন সে এভাবে তার অধিকার নাকচ করে দেয়। এখন যদি সে তৃতীয়বার তালাক দেয় তহলে এই নারী তার জন্যে হারাম (নিষিদ্ধ) হয়ে যায়। তবে যদি আরেক বিয়ে করে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথেও যদি তার বনিবনা না হয় এবং সেও তাকে তালাক দিয়ে দেয় তখন প্রথম স্বামী তার সাথে আবার বিয়ে করতে পারে।

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা এই কঠিন শর্তের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন— "এর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামীকে শাস্তিদান এবং তার আক্কেল দুরস্ত করা। কেননা, কোন আত্মসম্মানী স্বামী তার স্ত্রীকে অন্য কোন ব্যক্তির অঙ্কশায়িনী হতে দেখাটা সহ্য করবেনা এবং এজন্যে সে এ ধরণের কোন পদক্ষেপ নেওয়ার আগে হাজারবার ভেবে দেখবে যার কারণে সে চিরদিনের জন্যে তার স্ত্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে।"